# Live Written™ Weekly Editorials - 03

বিসিএস, ব্যাংক, ৯ম-১৩তম গ্রেডের চাকরিসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ চাকরির পরীক্ষায় অনুবাদ, ফোকাস, Essay, Composition ইত্যাদি থেকে সব সময় প্রশ্ন এসে থাকে। উল্লিখিত বিষয়গুলোতে একদিনে দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব নয়। যত বেশি অনুশীলন করা হবে, এই বিষয়গুলোতে তত বেশি দক্ষতা অর্জিত হবে। যেকোনো চাকরির লিখিত পরীক্ষায় এগিয়ে থাকতে বেশি বেশি লেখার অনুশীলনের বিকল্প নেই। পরীক্ষার সময় দ্রুত লিখতে না পারার কারণে অনেক সময় সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না। তাই প্রতিনিয়ত অনুশীলনের মাধ্যমে হাতের লেখার দ্রুততা ও লেখার মানসম্মত উপস্থাপন আয়ত্ত্ব করা উচিত।

Live Written অ্যাপে প্রতি সপ্তাহে পত্রিকায় প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্লেষণধর্মী সম্পাদকীয় ও কলাম নিয়ে “Weekly Editorial” PDF আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে। এই স্টাডি ম্যাটেরিয়েলস্ এর মাধ্যমে সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

তাছাড়া একটি পিডিএফ এর উপর প্রতি সপ্তাহে দুইটি করে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি মাসে বিগত ৪টি পিডিএফের উপর একটি রিভিশন পরীক্ষাসহ মোট ৯টি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এই পরীক্ষাগুলোতে অংশগ্রহনের মাধ্যমে একদিকে আপনি যেমন আপনার লেখার গতি বাড়াতে পারবেন, তার পাশাপাশি আমাদের এক্সপার্টদের মাধ্যমে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে লেখার মান যাচাই করতে পারবেন। তাই লেখার গতি বাড়াতে এবং লেখার মান উন্নয়ন ও যাচাইয়ে এই পরীক্ষাগুলোতে অংশগ্রহনের বিকল্প নেই।

❒ **যেসব চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য প্রযোজ্য:**

- ✓ বিসিএস লিখিত প্রস্তুতি
- ✓ ব্যাংক লিখিত প্রস্তুতি
- ✓ পেট্রোবাংলা, পাওয়ার সেক্টর লিখিত প্রস্তুতি
- ✓ অন্যান্য চাকরির লিখিত প্রস্তুতি

❒ **Weekly Editorials এর উপরে Live Written অ্যাপে পরীক্ষার টপিকসমূহ:**

1. Translation [Bangla to English]
2. Translation [English to Bangla]
3. Focus Writing in English
4. Focus Writing in Bangla
5. Summary/Precis Writing
6. প্রবন্ধ রচনা/Essay Writing
7. অনুচ্ছেদ/Paragraph
8. রচনামূলক/বিশ্লেষণাত্মক প্রশ্ন/Empirical Question

আশা করি, আমাদের এই কোর্স প্ল্যান, স্টাডি ম্যাটেরিয়েলস্ এবং পরীক্ষাগুলো সকল ধরনের চাকরির লিখিত প্রস্তুতিতে আপনাদের সহায়তা করবে।

**ধন্যবাদান্তে,**
Live Written টিম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কপিরাইট আইন দ্বারা সংরক্ষিত।
Live Written™ অ্যাপ, সাইট কিংবা লেকচার কোন অংশ নকল করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
© CrackTech

# অনুবাদ ও বিশ্লেষণসহ গুরুত্বপূর্ণ ২টি সম্পাদকীয়

## ১. বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের জন্য চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) নতুন সামাজিক ও পরিবেশগত নির্দেশিকা বাংলাদেশের পোশাক রফতানিতে বাধা হয়ে দাঁড়াবে নাকি ব্যবসার নতুন দ্বার উন্মোচন করবে, সে বিষয়ে চিন্তার প্রয়োজন আছে। গত ২৪ এপ্রিল ইইউ করপোরেট সাসটেইনেবিলিটি ডিউ ডিলিজেন্স নির্দেশিকা (ইউসিএসডিডিডি) কার্যকর হয়। এ আইন সামাজিক ও পরিবেশগত মানদণ্ডকে ব্যবসায়িক নীতির সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিয়মকে আমূল পরিবর্তন করতে পারে। এ নতুন নিয়মাবলি বিশ্বজুড়ে তীব্র বিতর্কের সূচনা করেছে। এশিয়ায়, বিশেষ করে বাংলাদেশে ব্যবসায়ীরা উদ্বিগ্ন, কারণ কঠোর সামাজিক ও পরিবেশগত মানদণ্ড পোশাক রফতানি বাণিজ্যকে বাধাগ্রস্ত করে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি থামিয়ে দিতে পারে। অন্যদিকে ইউরোপীয় সমর্থকরা ইউসিএসডিডিডি' কে মানবাধিকার ও পরিবেশ রক্ষার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে প্রশংসা করছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ধারাকে সমুন্নত রাখার জন্য শিগগিরই এ দ্বন্দ্ব হতে বেরিয়ে আসা প্রয়োজন এবং বিশ্বব্যাপী সামাজিক ও পরিবেশগত টেকসই মানদণ্ডকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ কৌশল প্রণয়ন করা অতীব প্রয়োজন।

বড় বড় ইউরোপীয় করপোরেট সংস্থা এবং যারা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে কাজ করে তাদের বিশ্বব্যাপী সাপ্লাইচেইনে মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধ এবং পরিবেশগত ক্ষতি হ্রাস করতে গভীর দায়িত্বশীল হতে ইইউ নির্দেশিকায় জোর দেয়া হয়েছে। এ রূপান্তরমূলক নীতি ৯ হাজার ৪০০টিরও বেশি বড় কোম্পানি এবং প্রায় ৩ হাজার ৪০০টি উচ্চ প্রভাবিত খাত যেমন টেক্সটাইল ও খনিজ শিল্পে কোম্পানিকে আরো দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ গ্রহণের দিকে পরিচালিত করবে। এছাড়া যে ছোট ছোট কারখানা বড় কোম্পানিগুলোর সাবকন্ট্রাক্টর বা সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করে তাদের ওপরও এ কঠোর মানদণ্ডগুলো মেনে চলতে নির্দেশিকা প্রভাব বিস্তার করবে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের এ নতুন আইনটি, জাতিসংঘের নিয়মকানুন এবং ওইসিডির দিকনির্দেশনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছে। এছাড়া ২০২১ সালের ইউরোপীয় সংসদের একটি প্রতিবেদন এ আইন তৈরিতে সাহায্য করেছে। এ আইনের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় কমিশন মানবাধিকার, পরিবেশ রক্ষা এবং অর্থনীতির উন্নতি—এ তিন বিষয়কে একসঙ্গে বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে। এ প্রতিশ্রুতি জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যগুলো এবং পরিবেশ সংক্রান্ত প্যারিস চুক্তির উদ্দেশ্যগুলোর সঙ্গে ও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বিগত কয়েক দশকে অনেক পোশাক শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বাংলাদেশী কোম্পানি বেসরকারি সার্টিফিকেশন সংস্থা যেমন এস.এ ৮০০০, এথিক্যাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভ বা ফেয়ার ওয়ার ফাউন্ডেশনের অধীনে সার্টিফায়েড হওয়ার জন্য চেষ্টা করেছে। এ সনদগুলো পাওয়ার জন্য নিরীক্ষা, কাগজপত্র এবং প্রশাসনিক খরচ তুলনামূলক বেশি লাগে, যা ছোট কোম্পানিগুলোর জন্য আর্থিক চাপ সৃষ্টি করে। দক্ষিণ ডেনমার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অনুসারে, বাংলাদেশে প্রায় তিন হাজার সার্টিফায়েড অডিটর এবং পরামর্শদাতা প্রতি বছর প্রায় ২৭ মিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করে থাকে। এছাড়া এই সার্টিফিকেশনগুলোর বাজার স্বীকৃতি সর্বদা নিশ্চিত নয়, ফলে ক্রেতারা সার্টিফিকেশন থাকা বা না থাকা যেকোনো কোম্পানিকে বেছে নিতে পারে। এতে ইউরোপীয় ক্রেতাদের কাউকে জবাবদিহি করতে হয় না। বেসরকারি সার্টিফিকেশনগুলো প্রায়ই কিছু মানুষ দ্বারা তৈরি নির্দেশিকা যা বেসরকারি সংস্থাগুলোর মালিকানাধীন হয়। শ্রম ও পরিবেশগত নির্দেশিকাগুলো মেনে চলা ঐচ্ছিক এবং প্রয়োগের কৌশল সাধারণত দুর্বল হয়। অন্যদিকে ইইউসিএসডিডিডি ইউরোপীয় ইউনিয়ন দ্বারা প্রণীত ইউরোপীয় ক্রেতা এবং তাদের সরবরাহকারীদের জন্যও একটি নীতিগত বাধ্যবাধকতা তৈরি করে।

যেসব আন্তর্জাতিক ক্রেতা কোম্পানি এ নতুন ইউরোপীয় আইন মেনে চলতে ব্যর্থ হবে, তারা ইউরোপীয় বাজার থেকে বাদ পড়তে পারে অথবা জরিমানাসহ নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হতে পারে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্রগুলো দ্বারা জাতীয় আইন প্রয়োগ পদ্ধতি কার্যকর হবে। এছাড়া ইউসিএসডিডিডির পরিসর বেসরকারি সার্টিফিকেশন সংস্থাগুলোর তুলনায় ব্যাপক, যা সাপ্লাইচেইন জুড়ে পরিবেশ ও মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ আইন অনুসারে কোম্পানিগুলোকে দূষণ, শ্রমিক অধিকার লঙ্ঘন এবং সম্পদ আহরণের মতো সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ এবং হ্রাস করতে হবে। নির্দেশিকার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো

মানবাধিকার হিসেবে জীবনধারণযোগ্য মজুরি এবং জীবনধারণযোগ্য আয়ের স্বীকৃতি, যা কোম্পানিগুলোকে তাদের পরিচালনাগত কৌশলে অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য করবে। নির্দেশিকা অবশ্য পালনীয়, ব্যাপক পরিসর, প্রয়োগ এবং স্বচ্ছতার ওপর জোর দেয়া ইউসিএসডিডিডি, বেসরকারি সার্টিফিকেশনের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা। যেসব বাংলাদেশী পোশাক ও টেক্সটাইল ব্যবসায়ীরা ইউরোপীয় ক্রেতাদের সঙ্গে ব্যবসা চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক, তাদের অবশ্যই ইইউসিএসডিডি নীতিমালা মেনে চলতে হবে।

বাংলাদেশের টেক্সটাইল ও পোশাক শিল্পের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ জীবনধারণযোগ্য মজুরি ও জীবনধারণযোগ্য আয় নির্ধারণ। ইইউসিএসডিডি বাংলাদেশের গার্মেন্ট ও টেক্সটাইল ব্যবসার জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করলেও এটি ছোট ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য অনেক চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসবে। ইউসিএসডিডিডির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে হলে প্রচুর সময় ও আর্থিক বিনিয়োগের প্রয়োজন পড়বে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শ্রমিক অধিকার এবং কর্ম পরিবেশের উন্নতি, পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা এখনো উদ্বেগের বিষয়। প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে জীবনধারণযোগ্য মজুরি এবং জীবনধারণযোগ্য আয় নিশ্চিত করা, যা দেশের জন্য একটি সংবেদনশীল বিষয়।

এ সমস্যা আরো জটিল হয়, কারণ বাংলাদেশের পোশাক ও টেক্সটাইল শিল্প মূল্যসংবেদনশীল, উচ্চ উৎপাদন ও কম মুনাফার ব্যবসা মডেল অনুসরণ করে। যেহেতু বাংলাদেশে জীবনধারণযোগ্য মজুরি নিয়ে কোনো আইন নেই, তাই মজুরি ব্যবস্থা, মূল্য নির্ধারণ মডেল এবং সরবরাহ চেইন ব্যবস্থাপনা পুনর্গঠন এবং সামগ্রিক ব্যবসায়িক পরিচালনা পুনর্বিন্যাস করে এ উন্নত মানদণ্ডগুলো মেনে চলার জন্য জোর দেয়া প্রয়োজন যেন স্বচ্ছতার সঙ্গে ইউরোপীয় বাজারে ব্যবসায়ের প্রসার ঘটতে পারে।

বাংলাদেশের টেক্সটাইল ও পোশাক শিল্পের ওপর সামগ্রিক প্রভাব রাখতে পারে ইইউর নতুন নির্দেশিকা। অর্থনীতির একটি প্রধান ভিত্তি টেক্সটাইল ও পোশাক শিল্প। বাংলাদেশের মোট রফতানি আয়ের প্রায় ৮৪ শতাংশ আসে এ শিল্প থেকে। দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে এ শিল্প। প্রায় ৪০ লাখের মতো মানুষ এ খাতে নিযুক্ত, যাদের অধিকাংশই নারী। এতে করে নারীদের আর্থিক স্বাধীনতা বৃদ্ধি পায় এবং সামাজিক অবস্থানের উন্নতি ঘটে।

বাংলাদেশের পোশাক ও টেক্সটাইল শিল্পের জন্য ইউরোপীয় বাজারের প্রবেশাধিকার ধরে রাখা অপরিহার্য। ২০২১ সালে বাংলাদেশ ৩৮ বিলিয়ন ইউরো মূল্যের পণ্য ইউরোপে রফতানি করেছে, যা ইউরোপীয় ইউনিয়নকে তার সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, শুধু তৈরি পোশাক থেকেই ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট রফতানির ৮৪ শতাংশ আয় হয়েছে। ইউরোস্ট্যাটের তথ্য অনুসারে, বাংলাদেশের পোশাক ও টেক্সটাইল রফতানির প্রায় ৯০ শতাংশ ইউরোপে যায়। তাই ইউসিএসডিডিডির ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে এবং তা মেনে চলা বাংলাদেশী নির্মাতাদের জন্য জরুরি।

ইইউর নতুন নির্দেশকায় বেশকিছু চ্যালেঞ্জ থাকলেও বাংলাদেশ ইচ্ছা করলে তা সুযোগে রূপান্তর করতে পারবে। বাংলাদেশের টেক্সটাইল ও পোশাক শিল্পের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ, নতুন ডিজিটাল টুলস এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা অত্যন্ত প্রয়োজন। এজন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের উচিত এ সেক্টরকে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে একটি বিশেষ ফান্ড গঠন করা। এছাড়া ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো এবং স্থানীয় টেক্সটাইল কারখানাগুলোর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারত্ব গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি, যা ইইউসিএসডিডিডি যে প্রভাব তৈরি করতে চায় তা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ইউরোপীয় পোশাক ব্র্যান্ডগুলোর উচিত নতুন কৌশল ও পদ্ধতি তৈরি করা যাতে করে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোয় বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের প্রবেশাধিকার সমুন্নত থাকে। এছাড়া ইউসিএসডিডিডির বাস্তবায়নে শ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়ন এবং বিশেষত বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে অর্থপূর্ণ যোগাযোগ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যাতে সবার অংশগ্রহণ ও কাজের সুযোগ সমুন্নত থাকে এবং ব্যবসায়িক স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়।

আশা করা যায়, ইউসিএসডিডিডির মানদণ্ডগুলো মেনে চলার মাধ্যমে বাংলাদেশের টেক্সটাইল ও পোশাক শিল্প ইউরোপীয় বাজারে একটি প্রতিযোগী সুবিধা লাভ করবে এবং নিয়ম মেনে উৎপাদিত পণ্যের প্রতি আগ্রহী গ্রাহকগোষ্ঠীকে আকৃষ্ট করতে পারবে। এ নতুন আইন ইউরোপীয় বাজারের সঙ্গে বাণিজ্য সুযোগ বৃদ্ধি করতে পারে, যা বাংলাদেশকে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে আলাদা করে তুলবে।

**লেখক:** শতদ্রু চট্টোপাধ্যায়, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সলিডারিডাড নেটওয়ার্ক এশিয়া।
**সূত্র:** বণিক বার্তা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কপিরাইট আইন দ্বারা সংরক্ষিত।
Live Written™ অ্যাপ, সাইট কিংবা লেকচার কোন অংশ নকল করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
© CrackTech

## ❐ গুরুত্বপূর্ণ শব্দার্থ/Word Meaning:

| | |
|---|---|
| আমূল পরিবর্তন - Radical change | দায়িত্বশীল – Responsible |
| নিয়মাবলি – Rules | প্রশাসনিক – Administrative |
| উদ্বিগ্ন – Anxious | পরামর্শদাতা - Adviser; Counsellor |
| মানদণ্ড – Criteria | জবাবদিহি – Accountability |
| টেকসই – Durable; Long lasting | নির্দেশিকা – Directory; Guidelines |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ – Compatible | ঐচ্ছিক - Pptional; Elective |
| রূপান্তরমূলক – Transformative<br>নিষেধাজ্ঞা – Prohibition; Embargo | নীতিগত বাধ্যবাধকতা - Policy obligations<br>কার্যকর – Effective |
| শনাক্তকরণ – Identification; Detection | মৌলিক বৈশিষ্ট্য – Basic feature |
| জীবনধারণযোগ্য - Livable | ন্যায্য মজুরি – Fair wages |
| উদ্বেগ - Concern | সংবেদনশীল – Sensitive; Sensory |
| মূল্যসংবেদনশীল – Price sensitive | সরবরাহ চেইন ব্যবস্থাপনা – Supply chain management |
| পুনর্গঠন - Reconstruction | প্রবেশাধিকার - Admittance |
| অংশীদার – Partner; Share holder | অংশীদারত্ব - Partnership |
| সমুন্নত – Elevated; Dignified | গ্রাহকগোষ্ঠী – Customer group |

❐ **অনুবাদ:** সম্পাদকীয় থেকে কিছু অংশ Translate করে দেয়া হলো-

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) নতুন সামাজিক ও পরিবেশগত নির্দেশিকা বাংলাদেশের পোশাক রফতানিতে বাধা হয়ে দাঁড়াবে নাকি ব্যবসার নতুন দ্বার উন্মোচন করবে, সে বিষয়ে চিন্তার প্রয়োজন আছে। গত ২৪ এপ্রিল ইইউ করপোরেট সাসটেইনেবিলিটি ডিউ ডিলিজেন্স নির্দেশিকা (ইউসিএসডিডিডি) কার্যকর হয়। এ আইন সামাজিক ও পরিবেশগত মানদণ্ডকে ব্যবসায়িক নীতির সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিয়মকে আমূল পরিবর্তন করতে পারে। এ নতুন নিয়মাবলি বিশ্বজুড়ে তীব্র বিতর্কের সূচনা করেছে। এশিয়ায়, বিশেষ করে বাংলাদেশে ব্যবসায়ীরা উদ্বিগ্ন, কারণ কঠোর সামাজিক ও পরিবেশগত মানদণ্ড পোশাক রফতানি বাণিজ্যকে বাধাগ্রস্ত করে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি থামিয়ে দিতে পারে। অন্যদিকে ইউরোপীয় সমর্থকরা ইউসিএসডিডিডি'কে মানবাধিকার ও পরিবেশ রক্ষার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে প্রশংসা করছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ধারাকে সমুন্নত রাখার জন্য শিগগিরই এ দ্বন্দ্ব হতে বেরিয়ে আসা প্রয়োজন এবং বিশ্বব্যাপী সামাজিক ও পরিবেশগত টেকসই মানদণ্ডকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ কৌশল প্রণয়ন করা অতীব প্রয়োজন।

It is necessary to consider whether Bangladesh's garment exports will be hindered by the new social and environmental regulations of the European Union (EU) or if they will create new opportunities for trade. On April 24, the EU's Corporate Sustainability Due Diligence Directive (UCSDDD) went into force. The Act's direct linkage of social and environmental standards to corporate policies has the potential to drastically alter the regulations governing international trade. Global discussion over the new rules has become very heated. Asian businessmen, especially those in Bangladesh, are worried that tighter social and environmental regulations may stunt economic expansion by impeding the export of clothing. Conversely, proponents in Europe are praising the UCSDDD as a significant step toward safeguarding the environment and human rights. It is critical to resolve this conflict and develop a cogent plan that complies with international standards for social and environmental sustainability if developing nations like Bangladesh are to continue experiencing economic growth.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কপিরাইট আইন দ্বারা সংরক্ষিত।
Live Written™ অ্যাপ, সাইট কিংবা লেকচার কোন অংশ নকল করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
© CrackTech

বড় বড় ইউরোপীয় করপোরেট সংস্থা এবং যারা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে কাজ করে তাদের বিশ্বব্যাপী সাপ্লাইচেইনে মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধ এবং পরিবেশগত ক্ষতি হ্রাস করতে গভীর দায়িত্বশীল হতে ইইউ নির্দেশিকায় জোর দেয়া হয়েছে। এ রূপান্তরমূলক নীতি ৯ হাজার ৪০০টিরও বেশি বড় কোম্পানি এবং প্রায় ৩ হাজার ৪০০টি উচ্চ প্রভাবিত খাত যেমন টেক্সটাইল ও খনিজ শিল্পে কোম্পানিকে আরো দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ গ্রহণের দিকে পরিচালিত করবে। এছাড়া যে ছোট ছোট কারখানা বড় কোম্পানিগুলোর সাবকন্ট্রাক্টর বা সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করে তাদের ওপরও এ কঠোর মানদণ্ডগুলো মেনে চলতে নির্দেশিকা প্রভাব বিস্তার করবে।

Major European corporate organizations and those collaborating with the EU are required by EU directive to assume increased accountability for stopping violations of human rights and mitigating environmental harm in their international supply chains. More than 9,400 major corporations and about 3,400 businesses in high-impact industries like minerals and textiles will implement more ethical business practices as a result of this revolutionary policy. Besides, the directive will also influence small factories that work as subcontractors or suppliers of big companies to adhere to these strict standards.

ইউরোপীয় ইউনিয়নের এ নতুন আইনটি, জাতিসংঘের নিয়মকানুন এবং ওইসিডির দিকনির্দেশনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছে। এছাড়া ২০২১ সালের ইউরোপীয় সংসদের একটি প্রতিবেদন এ আইন তৈরিতে সাহায্য করেছে। এ আইনের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় কমিশন মানবাধিকার, পরিবেশ রক্ষা এবং অর্থনীতির উন্নতি—এ তিন বিষয়কে একসঙ্গে বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে। এ প্রতিশ্রুতি জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যগুলো এবং পরিবেশ সংক্রান্ত প্যারিস চুক্তির উদ্দেশ্যগুলোর সঙ্গে ও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

The OECD guidelines and UN regulations served as the model for the new EU law. A report from the European Parliament in 2021 also influenced the law's design. The European Commission is attempting to address three issues with this law: economic development, environmental protection, and human rights. Additionally, this commitment aligns with the goals of the Paris Agreement on the Environment and the Sustainable Development Goals of the United Nations.

## 2. Are multilateral financial institutions doing enough to ensure climate justice?

The Spring Meetings of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank convened during the 3rd week of April, 2024. This is the first time the meeting failed to have an agreed communique, because of dissensus among member states on a number of geopolitical issues. A stock take was done about the reform evolution of the World Bank's mission to better respond to global challenges. The series of meetings focused on issues like the capital expansion of the multilateral financial institutions (MFIs) for addressing global challenges like climate change and the soaring debt burdens, both of which are related to the functioning of the Bretton Woods system.

First about enhanced financing for global development by the World Bank: a pledge to increase funding by more than $5 billion a year, so this could potentially generate up to $50[1] billion of investment for tackling global challenges over the next decade. Besides, the 10 heads of multilateral development banks (MDBs) also agreed to generate an additional $300-400 billion over the next decade to finance global


© CrackTech

development including climate change and SDGs. Besides, The MDB heads pledged to boost climate actions that include designing the first common approach to measuring outcomes and aligning their operations to the Paris Agreement goals. Also, they agreed to jointly report on climate financing and their engagement in achieving the new collective goal on climate finance. Another initiative was taken where 11 rich countries committed to a new Livable Planet Fund totalling $11 billion to support the SDGs, which is expected to leverage six to seven times more money over the coming decade. Besides, pressure has been mounting for reforms of the MFIs in the hopes of boosting climate finance through measures such as grants and low-cost loans, special drawing rights, and co-investment with the private sector.

The IMF and the World Bank are taking an increasing interest in climate financing, where spending by the World Bank reached almost $32 billion in 2022. Now the IMF has its Resilience and Sustainability Trust (RST), created last year to provide long-term concessional financing for adaptation and energy transition, under which a number of countries, including Bangladesh, reached an agreement. However, these steps are extremely short of the growing needs for addressing the increasing impacts of climate change. There are estimates of $2.4 trillion a year needed by 2030 to shift on to a decarbonisation track, that is compatible with limiting average temperature increases to 1.5 degrees Celsius.

But the supply continues to witness a shortfall. Still, the Global South does not agree that the long-pledged climate finance of $100 billion goal has been met. Against this, in 2024, debt repayment that developing countries are likely to pay will be over $400 billion, which is $50 billion more than they are expected to get as new grants and loans. So, there is a net outflow of direly needed resources from the Global South, particularly from the LICs. Today, about 60 percent of low-income countries are either in debt distress or at high risk of it. A new UN report on SDG financing shows how prioritising debt over basic services like food, health care and education plagues the developing world, and that for the least-developed countries, debt service will amount to $40 billion annually between 2023 and 2025, up more than 50 percent from $26 billion in 2022. More frequent and destructive climate disasters account for more than half of the debt in these vulnerable countries. Against this, the UN Chief warns of growing inequalities, and trust in institutions and solidarity between developing and developed countries as "low and falling." So, Guterres is calling for mobilising $500 billion a year of additional investments in sustainable development and climate action.

While attending the meetings, President-designate Mukhtar Babayev of COP29 emphasised that climate finance remained the top priority for the Baku Summit, expecting the flow of climate finance to increase by "several multiples." In a similar vein, the UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) Executive Secretary talks of the need for a "quantum leap" in climate finance. So, a small group of nations led by Barbados, France and Kenya met on the side lines to push for more taxes on fossil fuel burning that developing nations could use to deal with climate shocks. Besides, discussions are ongoing about some levies on air travel and maritime transport for mobilising extrabudgetary resources.

© CrackTech
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কপিরাইট আইন দ্বারা সংরক্ষিত।
Live Written™ অ্যাপ, সাইট কিংবা লেকচার কোন অংশ নকল করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

The meeting also reviewed the Global Sovereign Debt Roundtable (GSDR) initiated last year to accelerate negotiations on debt restructuring through negotiations among major creditors including China and the diverse group of private investors. At the end, the reforms must include the provision of grants for adaptation in the most impacted countries, debt cancellation for the most debt distressed ones, long term concessional loans and changes in the lending practices of MDBs that allow capital flowing back to developing countries. The reform also has to include putting climate-resilient debt clauses in loan agreements, with suspension of debt repayments during the time a country recovers.

But frustrations from the leaders of low-and middle-income countries keep mounting. Mia Mottley, the Barbados Prime Minister who is most vocal about MFI reforms with the Bridgetown Initiative, accuses developed countries of double-speak—manifest in them telling lower income countries to refrain from doing things like not printing money, yet during the Covid-19 pandemic, they did not shy away from it themselves. sermonising of doing not what they do, but doing what they tell the developing countries to do. She also alleges that the development paradigm still reflects the colonial framework of power relationships. In a similar vein, Amina Mohammed, the deputy UN secretary general, asked whether the responses of the MFIs reflect "one humanity", or if there is a deviation of our "moral compass".

This deviation is evident in the acute dearth of political will, not money. We may recall the lesson that Adam Smith, the father of Classical Economics taught us, that interests either at individual or national levels are bounded with one another. To realise our interests, we need to respect the interests of others in a free market system, upon which our climate regime is founded. Are we doing it? So, the billion-dollar question today before humanity is—how can the moral compass be directed to reverse the dysfunctional world order, as the UN Chief calls it.

**Writer:** Mizan R Khan, Independent consultant and technical lead, LDC Universities' Consortium on Climate Change (LUCCC).
**Source:** The Daily Star.

❒ **গুরুত্বপূর্ণ শব্দার্থ/Word Meaning:**

| | |
|---|---|
| Convene - সভা আহ্বান করা; সমবেত হওয়া বা হতে আহ্বান জানানো। | Leverage - লিভারের ক্রিয়া; লিভার ব্যবহারের প্রণালি; লিভার ব্যবহারের ফলে লব্ধ সুবিধা। |
| Communique - ইশতেহার; সরকারি ঘোষণা। | Soaring – উড্ডয়ন। |
| Dissensus – মতভেদ। | Resilience - আগের অবস্থায় ফিরে আসার গুণাবলি, স্থিতিস্থাপকতা। |
| Multilateral – বহুমুখী। | Sustainability – স্থায়িত্ব। |
| Capital expansion – মূলধন সম্প্রসারণ। | Concessional – ছাড়। |
| Shortfall – ঘাটতি। | Distress – চরম বিপদ; সংকট। |
| Grant - প্রদান করতে সম্মত হওয়া। | Plague - মহামারী; মড়ক। |
| Outflow – বহিঃপ্রবাহ; নিঃসরণ। | Solidarity - সংহতি। |

| | |
|---|---|
| Mobilise – সচল করা। | Extrabudgetary – অতিরিক্ত বাজেট। |
| Diverse - নানা রকম; বিভিন্ন রকম; একাধিক। | Suspension - সাময়িক বরখাস্তকরণ/কর্মচ্যুতি। |
| Mount - পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া; চড়া। | Manifest - সুস্পষ্ট; স্পষ্টত প্রতীয়মান। |
| Shy away – অপছন্দনীয় কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা। | Sermonise - হিতোপদেশ দেওয়া; নসিহত করা। |
| Acute - তীক্ষ্ণ; ক্ষিপ্র; সূক্ষ্ম; সূচ্যগ্র, তীব্র; বেধক। | Dearth - অভাব; অনটন; আকাল। |
| Dysfunctional – অকার্যকর। | World order – বিশ্ব ব্যবস্থা। |

❒ **অনুবাদ:** সম্পাদকীয় থেকে কিছু অংশ অনুবাদ করে দেয়া হলো-

The Spring Meetings of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank convened during the 3rd week of April, 2024. This is the first time the meeting failed to have an agreed communique, because of dissensus among member states on a number of geopolitical issues. A stock take was done about the reform evolution of the World Bank's mission to better respond to global challenges. The series of meetings focused on issues like the capital expansion of the multilateral financial institutions (MFIs) for addressing global challenges like climate change and the soaring debt burdens, both of which are related to the functioning of the Bretton Woods system.

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এবং বিশ্বব্যাংকের বসন্ত সভা ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়। কিছু বৈশ্বিক রাজনৈতিক বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মতানৈক্যের কারণে এটি প্রথম বারের মতো কোনো সর্বসম্মত ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করতে পারেনি। বিশ্বব্যাংকের লক্ষ্য ও কাজের ধারাবাহিকতা বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলায় আরও কার্যকর করার জন্য সংস্কারমূলক পদক্ষেপগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই সিরিজ সভাগুলোতে বহুপাক্ষিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর (এমএফআই) মূলধন সম্প্রসারণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং ক্রমবর্ধমান ঋণবোঝা মোকাবেলায় ব্রেটন উডস সিস্টেমের কার্যকারিতা সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

First about enhanced financing for global development by the World Bank: a pledge to increase funding by more than $5 billion a year, so this could potentially generate up to $50[1] billion of investment for tackling global challenges over the next decade. Besides, the 10 heads of multilateral development banks (MDBs) also agreed to generate an additional $300-400 billion over the next decade to finance global development including climate change and SDGs. Besides, The MDB heads pledged to boost climate actions that include designing the first common approach to measuring outcomes and aligning their operations to the Paris Agreement goals. Also, they agreed to jointly report on climate financing and their engagement in achieving the new collective goal on climate finance. Another initiative was taken where 11 rich countries committed to a new Livable Planet Fund totalling $11 billion to support the SDGs, which is expected to leverage six to seven times more money over the coming decade. Besides, pressure has been mounting for reforms of the MFIs in the hopes of boosting climate finance through measures such as grants and low-cost loans, special drawing rights, and co-investment with the private sector.


© CrackTech

প্রথমে বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে বৈশ্বিক উন্নয়নের জন্য উন্নত অর্থায়ন সম্পর্কে: প্রতি বছর ৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থায়ন বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, যাতে আগামী দশকে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ৫০ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত বিনিয়োগ তৈরি হতে পারে। এছাড়াও, বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংকগুলোর (এমডিবি) ১০ জন প্রধান আগামী দশকে জলবায়ু পরিবর্তন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) সহ বৈশ্বিক উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত ৩০০-৪০০ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করতে সম্মত হয়েছেন। এমডিবি প্রধানরা জলবায়ু কার্যক্রম বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে ফলাফল পরিমাপের জন্য প্রথম সাধারণ পদ্ধতি ডিজাইন করা এবং তাদের কার্যক্রমকে প্যারিস চুক্তির লক্ষ্যগুলোর সাথে সামঞ্জস্য করা। এছাড়াও, তারা যৌথভাবে জলবায়ু অর্থায়ন এবং জলবায়ু অর্থায়নের নতুন যৌথ লক্ষ্য অর্জনে তাদের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য সম্মত হয়েছেন। আরেকটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যেখানে ১১টি ধনী দেশ এসডিজি সমর্থনে ১১ বিলিয়ন ডলার মূল্যের একটি নতুন লাইভেবল প্ল্যানেট ফান্ডে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে, যা আগামী দশকে ছয় থেকে সাত গুণ বেশি অর্থ সংগ্রহ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়াও, অনুদান এবং কম খরচের ঋণ, স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস এবং বেসরকারি খাতের সাথে সহ-নিবেশের মতো পদক্ষেপের মাধ্যমে জলবায়ু অর্থায়ন বৃদ্ধির আশায় এমএফআইগুলোর সংস্কারের জন্য চাপ বাড়ছে।

The IMF and the World Bank are taking an increasing interest in climate financing, where spending by the World Bank reached almost $32 billion in 2022. Now the IMF has its Resilience and Sustainability Trust (RST), created last year to provide long-term concessional financing for adaptation and energy transition, under which a number of countries, including Bangladesh, reached an agreement. However, these steps are extremely short of the growing needs for addressing the increasing impacts of climate change. There are estimates of $2.4 trillion a year needed by 2030 to shift on to a decarbonisation track, that is compatible with limiting average temperature increases to 1.5 degrees Celsius.

আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংক জলবায়ু অর্থায়নে ক্রমবর্ধমান আগ্রহ দেখাচ্ছে, যেখানে ২০২২ সালে বিশ্বব্যাংকের ব্যয় প্রায় ৩২ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। এখন আইএমএফের রেজিলিয়েন্স অ্যান্ড সাস্টেইনেবিলিটি ট্রাস্ট (আরএসটি) রয়েছে, যা গত বছর দীর্ঘমেয়াদি স্বল্প সুদের অর্থায়ন প্রদানের জন্য তৈরি করা হয়েছে অভিযোজন এবং শক্তি রূপান্তরের জন্য, যার অধীনে বাংলাদেশসহ বেশ কয়েকটি দেশ একটি চুক্তিতে পৌঁছেছে। তবে, এই পদক্ষেপগুলি ক্রমবর্ধমান জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত কম। অনুমান করা হয়েছে যে ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বনমুক্ত পথে স্থানান্তরের জন্য প্রতি বছর ২.৪ ট্রিলিয়ন ডলার প্রয়োজন, যা গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ করার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

# আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয়

## ৩. অফশোর ব্যাংকিং বাংলাদেশে 'উদার' করা হচ্ছে কেন?

বাংলাদেশে অফশোর ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়ে নতুন যে আইনটি চূড়ান্ত করা হয়েছে তাতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ বৃদ্ধি, রিজার্ভ সংকট ও এলসি খোলার সংকট সমাধান-সহ বিদেশি বিনিয়োগ আরও উৎসাহিত হবে বলে মনে করছেন ব্যাংক খাত সংশ্লিষ্টরা। তারা বলছেন, কোনও ব্যক্তি নয় বরং আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে অফশোর ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলেই এই আইন জরুরি ছিলো।

কিন্তু গণমাধ্যমে আলোচনায় আসা এই অফশোর ব্যাংকিং আসলে কী? সাধারণ ব্যাংকিং-এর সাথে এর পার্থক্যই বা কী? কারা এর গ্রাহক? এই ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সরকারের উপরই বা কী প্রভাব পড়বে?

**অফশোর ব্যাংকিং কী?**

অফশোর ব্যাংকিং হলো ব্যাংকের ভেতরে পৃথক ব্যাংকিং সেবা। প্রচলিত ব্যাংকিং বা শাখার কার্যক্রমের চেয়ে ভিন্ন অফশোর ব্যাংকিং। কারণ এ জাতীয় কার্যক্রমে আমানত গ্রহণ ও ঋণ দেয়ার দুই কার্যক্রমই বৈদেশিক উৎস থেকে আসে ও বিদেশী গ্রাহকদের দেয়া হয়। এই ব্যাংকিং কার্যক্রম শুধু অনিবাসীদের মধ্যেই সীমিত থাকে। বিদেশী কোম্পানিকে ঋণ দেয়া ও বিদেশী উৎস থেকে আমানত সংগ্রহের সুযোগ রয়েছে অফশোর ব্যাংকিংয়ে। স্থানীয় মুদ্রার পরিবর্তে বৈদেশিক মুদ্রায় হিসাব হয় অফশোর ব্যাংকিংয়ে। অফশোর ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যাংকের কোনো নিয়ম-নীতিমালা প্রয়োগ করা হয় না। আলাদা আইনকানুনের মাধ্যমে এ তহবিল পরিচালিত হয় ও হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। কেবল মুনাফা ও লোকসানের হিসাব যোগ হয় ব্যাংকের মূল মুনাফায়। অফশোর ইউনিট থেকে ব্যাংকগুলো বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ দিয়ে থাকে। এটি এমন ব্যাংকিং কার্যক্রমকে নির্দেশ করে যা শুধুমাত্র অনিবাসীদের যেমন মাল্টিন্যাশনাল পণ্য, সেবা এবং ফাইন্যান্সারদের সম্পৃক্ত করে। এটি দেশীয় ব্যাংকিংয়ের সাথে যুক্ত হয় না।

**নতুন আইনে যা বলা হয়েছে**

বাংলাদেশে ১৯৮৫ সালে অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনের ভিত্তিতে সে সময় কাজ শুরু হয়েছিল। পরে ২০১৯ সালে অফশোর ব্যাংকিং নীতিমালা জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংক। বুধবার অফশোর ব্যাংকিং আইন ২০২৪-এর খসড়ার নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ। এর ফলে বাংলাদেশে বিনিয়োগকারী অনিবাসী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানগুলো অফশোর অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে। এই খসড়ায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে তফসিলি ব্যাংকগুলোকে লাইসেন্স নিতে হবে। শুধুমাত্র লাইসেন্সধারী ব্যাংকগুলোতে অফশোর অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে। যাদের লাইসেন্স আছে তাদের নতুন করে নিতে হবে না।

বাংলাদেশে বর্তমানে ৩৯টি ব্যাংক অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ ধরনের ব্যাংকিং কার্যক্রমে যারা বিনিয়োগ করবে তারা বিদেশী বা অনিবাসী কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে হবে। অনুমোদিত এই আইনের অধীনে ব্যাংকগুলো বিদেশী বা অনিবাসী কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় যে আমানত গ্রহণ করবে, তা স্বাভাবিক ব্যাংকিং পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে পারবে। বিদেশে যে বাংলাদেশী বসবাস করছেন তার পক্ষে দেশে অবস্থানরত কোনো বাংলাদেশী নাগরিক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন। সহায়তাকারী হিসেবে তারা অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতে পারবেন। পাঁচ ধরণের বৈদেশিক মুদ্রা ডলার, পাউন্ড, ইউরো, জাপানি ইয়েন ও চীনা ইউয়ানে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।

.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কপিরাইট আইন দ্বারা সংরক্ষিত।
Live Written™ অ্যাপ, সাইট কিংবা লেকচার কোন অংশ নকল করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
© CrackTech

বর্তমানে যে অফশোর ব্যাংকিং ব্যবস্থা রয়েছে তাতে ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) না থাকলে আমানতের আয়ের উপর ১৫ শতাংশ কর দিতে হয়। আর টিআইএন থাকলে ১০ শতাংশ কর দিতে হয়। নতুন আইনে কোনো কর দিতে হবে না। একইসাথে অফশোর ব্যাংকিং লেনদেনে যে সুদ আসবে, তার উপর কোনো কর আরোপ করা হবে না। অ্যাকাউন্ট পরিচালনার জন্য কোনো সুদ বা চার্জ দিতে হবে না। বর্তমানে অনাবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের থেকে আমানত নেয়ার কোনো নিয়ম নেই। এ আইনটি পাস হলে তফসিলি ব্যাংকের অফশোর ইউনিটগুলো বিদেশীদের পাশাপাশি অনাবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের থেকেও আমানত নিতে পারবে। অনুমোদিত নতুন আইনে কোনো ঋণসীমা রাখা হয়নি। এতে যেকোনো পরিমাণ লেনদেন করা যাবে। বর্তমানে বাংলাদেশে ইপিজেডে যে অফশোর অ্যাকাউন্ট রয়েছে তা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট। এসব অ্যাকাউন্টে কোনো লাভ দেয়া হয় না। তবে নতুন আইনে অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রমে লাভ দেয়ার বিধান রাখা হয়েছে।

**অফশোর ব্যাংকিং-এর সুবিধা ও অসুবিধা**

ব্যাংকাররা বলছেন, এই ব্যাংকিং পদ্ধতিতে অসুবিধার চাইতে সুবিধাই বেশি। এই ব্যাংকিংয়ে যেকোনো কোম্পানি বা ব্যক্তি দেশ বিদেশে সহজ শর্তে ব্যবসা করতে পারবে। অনুমোদিত নতুন আইনের আওতায় সরকার এই ব্যাংকিং কার্যক্রমে আকর্ষণীয় সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে। প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে এর পার্থক্য হলো এতে বিধিনিষেধ একেবারেই কম। গ্রাহকের তথ্য সংক্রান্ত চূড়ান্ত গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়। তবে অসুবিধাও রয়েছে বলে মনে করছেন ব্যাংকাররা।

মেঘনা ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুরুল আমিন বিবিসি বাংলাকে বলেন, 'অতীতে এমন উদাহরণও রয়েছে, অফশোরের মাধ্যমে বিদেশ থেকে লোন নিয়ে দেশে ব্যবসা করছে। দেশে লোন শোধ করছে। এক্ষেত্রে তার এক্সপোর্ট সেভাবে না থাকলে ওই লোন শোধ হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে। তার মানে তাকে উল্টা করে লোকাল টাকা দিয়ে লোন শোধ করার সুযোগ নেই। পর্যাপ্ত এক্সপোর্টের মাধ্যমে কাভার না করলে ওই লোন পরিশোধ কঠিন হয়ে পড়ে।' এ সমস্যা রোধে তদারকি করা প্রয়োজন বলে মনে করছেন সাবেক এই ব্যাংকার। তিনি বলেন, 'যে কারণে লোন দেয়া হচ্ছে সেটা পালন হচ্ছে কিনা সেটা মনিটরিং জরুরি।' তিনি আরো বলেন, 'এই কার্যক্রমের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো দেশে বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ বাড়বে। কারণ যারা এতে অংশ নেবে তাদের সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের রেস্ট্রিকশন কম থাকবে। কারণ ফরেন কারেন্সির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ অনেক উদার করা হয়েছে।'

বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মাহবুব হোসেন সচিবালয়ে এই আইনের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন। গণমাধ্যমে তিনি বলেন, 'এটা এখন সর্বাধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা। পৃথিবীর বহু দেশ এ পদ্ধতি অনুসরণ করে তাদের বৈদেশিক রিজার্ভ ও আর্থিক কাঠামোকে সমৃদ্ধ করেছে। এতে করে তারা শত শত কোটি ডলার বিনিয়োগ পেয়েছে। এছাড়া আমরা এটিকে একটি অপশন হিসেবে ব্যবহার করছি, যাতে বিদেশীরা এসে টাকা রাখতে পারে। তবে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে টাকা নিয়ে যাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে অনুমতি নিতে হয়। অফশোর এই আইনে স্বাধীনভাবে অপারেট করা যাবে।'

মন্ত্রিপরিষদ সচিব আরো জানান, 'বাংলাদেশে যেসব বিদেশী বিনিয়োগ করে লভ্যাংশ নিয়ে যান, তখন তারা বাইরের অফশোর কোনো ব্যাংকিং ব্যবস্থায় টাকা রাখেন। আবার আমাদের এখানে যখন আনেন, তখন তারা আমাদের কোনো অভ্যন্তরীণ ব্যাংকে ঢোকান না। কারণ যখন তারা নিয়ে যাবেন তখন নানান বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এখানে একটা সুবিধা হবে বিদেশীরা ব্যবসা করে যে লভ্যাংশ পাবেন, সেটা এখন ব্যাংকে রাখবেন। কারণ এখন ব্যাংকে টাকা রাখলেই লাভ দেয়া হচ্ছে। যেটা আন্তর্জাতিক মানের। সুতরাং এখানে বিদেশীরা বিনিয়োগে আগ্রহী হবেন।' অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্যই এটি করা হচ্ছে বলে জানান হোসেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কপিরাইট আইন দ্বারা সংরক্ষিত।
Live Written™ অ্যাপ, সাইট কিংবা লেকচার কোন অংশ নকল করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
© CrackTech

বিভিন্ন ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানান, অফশোর ব্যাংকিং-এর আওতায় ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস অ্যাকাউন্ট খুলতে হয়। অনাবাসী বাংলাদেশীরা বিদেশ থেকে যখন দেশে থাকা অফশোর ব্যাংকিং-এর অ্যাকাউন্টে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠাবে, তখন সেই মুদ্রাতেই লেনদেন করবে। এছাড়া এ ধরনের অ্যাকাউন্টধারীদের সরকার প্রচুর ট্যাক্স বেনিফিট দিয়ে থাকে। ঊর্ধ্বতন ব্যাংক কর্মকর্তারা জানান, কোনো অনাবাসী ব্যক্তি বা কোম্পানি যখন বাংলাদেশের অফশোর অ্যাকাউন্টে বিদেশী মুদ্রা পাঠাবে তখন সে নিজের প্রয়োজনে এই অর্থ নিতে পারবে। পরিবারের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে। আবার টাকায় এনক্যাশ করে শেয়ার বা বন্ড কিনতে পারবে।

মূলত বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ বাড়ানো, রিজার্ভ সঙ্কট, এলসি খোলার সঙ্কট সমাধানে এই অফশোর ব্যাংকিং এর নতুন আইন কাজ করবে বলে মনে করছেন ঊর্ধ্বতন ব্যাংক কর্মকর্তারা।

**লেখক:** জান্নাতুল তানভী।

**সূত্র:** বিবিসি নিউজ বাংলা।

## ৪. পাকিস্তান, ভারত ও শ্রীলংকার তুলনায় কেমন বাংলাদেশের

আইএমএফের হিসাব মোতাবেক এরই মধ্যে বাংলাদেশ পাকিস্তান ও ভারতকে মাথাপিছু জিএনআইয়ের দিক থেকে ছাড়িয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে, যদিও ভারতের জনগণের জীবনযাত্রার মান এখনো বাংলাদেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানের চেয়ে বেশ খানিকটা ভালো। জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচকের বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে পাকিস্তানের অবস্থান প্রতি বছর নিচে নেমে যাচ্ছে। ২০২৩ সালে বাংলাদেশ যেখানে এক্ষেত্রে ক্রমোন্নতির ধারায় ১২৯ নম্বর অবস্থানে উন্নীত হয়েছে, সেখানে পাকিস্তানের অবস্থান নেমে গেছে ১৬১ নম্বরে, ভারতের অবস্থান ১৩৪ নম্বরে। ১৯৪৭-৭১ পর্বে পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানকে অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ হিসেবে শোষণ, বঞ্চনা, সীমাহীন বৈষম্য ও লুণ্ঠনের অসহায় শিকারে পরিণত করেছিল পাকিস্তানের শাসকরা, যার পরিণতিতে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু জিডিপি পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে ৭০ শতাংশ কম ছিল। ২০১৫ সালেই বাংলাদেশ পাকিস্তানকে মাথাপিছু জিডিপির হিসাবে পেছনে ফেলে এসেছে। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের তুলনাটা দেখুন:

১) মাথাপিছু জিডিপিতে বাংলাদেশ পাকিস্তানের তুলনায় ৭০ শতাংশ এগিয়ে গেছে।

২) বাংলাদেশের রফতানি আয় পাকিস্তানের চেয়ে ২০ বিলিয়ন ডলার বেশি, ২০২২-২৩ অর্থবছরে তা ছিল ৫৫ দশমিক ৫৬ বিলিয়ন ডলার।

৩) বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০২৪ সালের মে মাসে আইএমএফের হিসাব পদ্ধতি মোতাবেক ১৮ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যেটা পাকিস্তানের দ্বিগুণেরও বেশি।

৪) বাংলাদেশের জনগণের গড় আয়ু ৭২ দশমিক ৪ বছর, পাকিস্তানের ৬৬ বছর।

৫) বাংলাদেশের জনগণের সাক্ষরতার হার ৭৬ শতাংশ, পাকিস্তানের ৫৯ শতাংশ।

৬) বাংলাদেশের মোট জিডিপি ৪৬০ বিলিয়ন ডলার, পাকিস্তানের ৩৪৬ বিলিয়ন ডলার।

৭) বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১ দশমিক ১২ শতাংশ, পাকিস্তানের ২ দশমিক ১ শতাংশ। ফলে পাকিস্তানের জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪ কোটিতে আর বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৭ কোটির সামান্য বেশি।

৮) বাংলাদেশের ১১৭ টাকায় ১ ডলার পাওয়া যায়, পাকিস্তানে ১ ডলার কিনতে ২৫০ রুপি লাগে। অথচ ২০০৭ সাল পর্যন্ত রুপির বৈদেশিক মান টাকার তুলনায় ৮ শতাংশ, বেশি ছিল।

৯) বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক ঋণ জিডিপির ২৩ শতাংশ অথচ পাকিস্তানে তা জিডিপির ৪৬ শতাংশ।

১০) বাংলাদেশের নারীদের ৪১ শতাংশ বাড়ির আঙিনার বাইরে কর্মরত, পাকিস্তানে এ অনুপাত মাত্র ১৪ শতাংশ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কপিরাইট আইন দ্বারা সংরক্ষিত।
Live Written™ অ্যাপ, সাইট কিংবা লেকচার কোন অংশ নকল করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
© CrackTech

১১) বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর হার হাজারে ২১, পাকিস্তানে ৫৯।

১২) বাংলাদেশের শতভাগ জনগণ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে, অথচ পাকিস্তানের ৭৩ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ পাচ্ছে।

ওপরের তথ্য-উপাত্তগুলো সাক্ষ্য দিচ্ছে, পাকিস্তান অর্থনৈতিক উন্নয়নের দৌড়ে আর বাংলাদেশের নাগাল পাবে না। এ অবস্থার স্বীকৃতি মিলেছে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের মন্তব্যে। তিনি বলেছেন, 'বাংলাদেশের অগ্রগতি দেখে আমাদের লজ্জা হয়। আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদের বলা হতো পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বোঝা। এখন ওই বোঝা কোথায় পৌঁছেছে আর আমরা কোথায়।

অন্যদিকে আইএমএফের 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক' ২০২০-এর প্রক্ষেপণ মোতাবেক ওই বছরের ডিসেম্বর নাগাদ মাথাপিছু নমিনাল জিডিপির হিসাবে বাংলাদেশ ভারতকেও টপকে গেছে। মহামারীর আঘাতে ভারতীয় অর্থনীতি ১০ দশমিক ৩ শতাংশ সংকুচিত হয়ে সে দেশের মাথাপিছু নমিনাল জিডিপি ২০১৯ সালের ২ হাজার ১০০ ডলার থেকে ১ হাজার ৮৭৭ ডলারে নেমে গিয়েছিল। অন্যদিকে বাংলাদেশের অর্থনীতি মহামারীর আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও দ্রুত ক্ষতি কাটিয়ে উঠে ২০২০ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ ৩ দশমিক ৮ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে মাথাপিছু জিডিপিকে ১ হাজার ৮৮৮ ডলারে নিয়ে গেছে বলে জানিয়েছে আইএমএফ। ২০২৩ সালের জুনে বাংলাদেশীদের মাথাপিছু জিএনআই ২ হাজার ৭৬৫ ডলারে এবং ২০২৪ সালের মে মাসে ২ হাজার ৭৮৪ ডলারে পৌঁছেছে বলে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো তথ্য প্রকাশ করেছে। এ দাবি সত্য হলে এখনো বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু জিএনআই ভারতীয়দের চেয়ে বেশি রয়ে গেছে। (অবশ্য গত অর্থবছরে ভারতের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বাংলাদেশের চেয়ে বেশি ছিল)। পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি (পিপিপি) ভিত্তিতে ২০২২ সালে ভারতের প্রাক্কলিত মাথাপিছু জিএনআই ছিল ৮ হাজার ২১০ পিপিপি ডলার আর বাংলাদেশের ৬ হাজার ৮৯০ পিপিপি ডলার। এর মানে, ভারতে বেশির ভাগ পণ্য ও সেবার দাম বাংলাদেশের চেয়ে কম হওয়ায় ভারতের জনগণের জীবনযাত্রার মান বাংলাদেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানের চেয়ে উঁচু। প্রথমেই 'পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি' বা 'ক্রয়ক্ষমতার সমতা' ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করছি। বিশ্বের দেশে দেশে যেহেতু বিভিন্ন পণ্য ও সেবার দাম কমবেশি হয় সেজন্য বিভিন্ন দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানকে তুলনীয় করার জন্য 'পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি' পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে নমিনাল জিডিপিকে 'পিপিপি ডলারে জিডিপি' তে রূপান্তর করা হয়। এটা একটা যুগান্তকারী গবেষণার ফসল, কিন্তু পদ্ধতিটি বেশ টেকনিক্যাল হওয়ায় সাধারণ পাঠকদের কাছে বিষয়টি জটিল মনে হবে (কম্পিউটার প্রযুক্তি বিপ্লবের কারণেই পদ্ধতিটির প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে)। এ পদ্ধতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকশ পণ্য ও সেবার দামকে তুলনার একক হিসেবে ব্যবহার করে অন্যান্য দেশে একই পণ্য ও সেবাগুলোর দাম কতখানি বেশি বা কম তার তথ্য-উপাত্ত ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিটি দেশের মুদ্রার অভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতাকে মার্কিন ডলারের ক্রয়ক্ষমতার তুলনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসা হয় (অবশ্য এ পণ্যগুলোর বিরাট অংশ একটি উন্নয়নশীল দেশের ভোক্তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নাও হতে পারে)। ফলে যেসব দেশে পণ্য ও সেবার দাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে বেশি সে দেশগুলোর মাথাপিছু জিডিপিকে কমিয়ে আনা হয় এবং যেসব দেশে পণ্য ও সেবার দাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে কম সে দেশগুলোর মাথাপিছু জিডিপিকে বাড়িয়ে দেয়া হয়। সাধারণভাবে যেসব দেশের মাথাপিছু জিডিপি কম সেসব দেশে অধিকাংশ পণ্য ও সেবার দামও তুলনামূলকভাবে কম হয়, এক্ষেত্রে ভারত ও বাংলাদেশের ব্যাপারটা অনেকখানি ব্যতিক্রম। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিসহ বেশির ভাগ পণ্য ও সেবার দাম বাংলাদেশে ভারতের চেয়ে বেশি। খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা—যেগুলোকে 'মৌল প্রয়োজন' বলা হয় সেগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় সব পণ্য ও সেবার দাম বাংলাদেশে ভারতের চেয়ে বেশি। উদাহরণ: ১. চাল, আটা, ময়দা, মসলাপাতি, তরিতরকারি, ডাল, মুরগি, ডিম, দুধ, মাখন সবই ভারতে বাংলাদেশের চেয়ে সস্তা; ২. শার্ট, ট্রাউজার, জিন্স, টি-শার্ট ও জুতো-স্যান্ডেল ছাড়া নারী-পুরুষ-কিশোর-কিশোরী-শিশুর কাপড়-চোপড় ভারতে বাংলাদেশের চেয়ে সস্তা; ৩. ভারতে কম্পিউটারসহ অধিকাংশ ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক সামগ্রীর দাম বাংলাদেশের চেয়ে কম, মোবাইল টেলিফোন কল অবশ্য বাংলাদেশে সস্তা; ৪. ভারতে বিদেশী গাড়ি খুব বেশি ব্র্যান্ডের পাওয়া না গেলেও ভারতে উৎপাদিত গাড়ির দাম বাংলাদেশে আমদানি করা গাড়ির তুলনায় অনেক কম; ৫. ভারতের বেশির ভাগ শহরে এবং

গ্রামে জমিজমার দাম বাংলাদেশের চেয়ে কম; ৬. ভারতের ‘সেভেন সিস্টার্স’ রাজ্যগুলো ব্যতীত অন্যত্র অধিকাংশ নির্মাণসামগ্রীর দাম বাংলাদেশের চেয়ে কম, তাই অ্যাপার্টমেন্ট বা পাকা বাড়ির দাম এবং নির্মাণ খরচও কম; ৭. ভারতের শিক্ষা খরচ প্রাইমারি থেকে উচ্চতম লেভেল পর্যন্ত সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় বাংলাদেশের কাছাকাছি হলেও প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় শিক্ষা খরচ বাংলাদেশে ভারতের চেয়ে বেশি; ৮. স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা খরচ ভারতে বাংলাদেশের তুলনীয় পর্যায়ে হলেও এসব সেবার মান ভারতে উন্নততর; এবং ৯. ভারতে বাস, ট্রেন, ট্যাক্সি ও প্লেনের ভাড়া বাংলাদেশের তুলনায় কম। সাম্প্রতিক তথ্য-উপাত্ত বলছে, ভারতে মূল্যস্ফীতির হার ৪ শতাংশে নেমে এসেছে। অথচ বাংলাদেশে এখনো সরকারি হিসাব মোতাবেক মূল্যস্ফীতির হার ৯ দশমিক ৬ শতাংশ। সাধারণ জনগণের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মূল্যস্ফীতির হার বাংলাদেশে প্রকৃতপক্ষে আরো অনেক বেশি হবে। সেজন্যই বলছি, ভারতের জনগণের জীবনযাত্রার মান বাংলাদেশের চেয়ে নিশ্চয়ই ভালো রয়েছে।

২০২২ সালে শ্রীলংকার মাথাপিছু জিএনআই নমিনাল ডলারে ছিল ৩ হাজার ৬১০ ডলার এবং পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি পদ্ধতিতে ছিল ১৪ হাজার ৩০ পিপিপি ডলার। জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচকে শ্রীলংকার অবস্থান ৭৬ নম্বরে। যদিও ২০২১ সালে শ্রীলংকার অর্থনীতি মারাত্মক মেল্টডাউনের শিকার হয়েছিল, তবু এর প্রভাবে সে দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানে কতখানি বিপর্যয় ঘটেছে তার সর্বশেষ হিসাব আমরা পাইনি। ২০২২ সালে মাথাপিছু জিএনআই ৪ হাজার ডলার থেকে কমে যাওয়ায় তার কিছুটা আলামত মিলেছে। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত থেকে জানা যাচ্ছে যে ২০২৪ সালে শ্রীলংকার অর্থনীতি বিপর্যয় অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছে। শ্রীলংকায় এখন মূল্যস্ফীতির হার নাকি ৫ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দামও নাকি আবার সাধারণ জনগণের নাগালে চলে এসেছে। তাদের পর্যটন শিল্প আবার আগের অবস্থায় ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। প্রবাসীদের রেমিট্যান্স প্রবাহে যে ধস নেমেছিল তাও নাকি প্রায় কাটিয়ে ওঠা গেছে। তবু সর্বশেষ হিসাবে শ্রীলংকার মাথাপিছু জিএনআই বর্তমানে আবার ৪ হাজার নমিনাল ডলারে ফিরে যেতে পেরেছে কিনা জানা যায়নি। তবু বলতে হবে অর্থনৈতিক মেল্টডাউনের সাময়িক বিপর্যয় সত্ত্বেও শ্রীলংকার জনগণের জীবনযাত্রার মান হয়তো ২০২৪ সালে ভারত ও বাংলাদেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানের চেয়ে ভালো রয়ে গেছে। শ্রীলংকার শতভাগ জনগণ শিক্ষিত, ফলে শ্রীলংকায় দক্ষ জনশক্তির অনুপাত ভারত ও বাংলাদেশের চেয়ে বেশি। ওখানকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাও শতভাগ জনগণের সাধ্যের মধ্যে রয়েছে বলে মনে করা হয়। শ্রীলংকার পরিবহন ব্যবস্থাও বাংলাদেশের তুলনায় ব্যয়সাশ্রয়ী। ওখানে শহর ও গ্রামের জনগণের জীবনযাত্রার মানের ব্যবধান খুব বেশি নয়। রাজধানী কলম্বোর জনসংখ্যা ৫৬ লাখের মতো, অথচ ১৯৭২ সালে কলম্বো ঢাকার চেয়ে জনসংখ্যার দিক থেকে বড় নগর ছিল। কিন্তু অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে শ্রীলংকার শাসকরা কলম্বোর জনসংখ্যাকে দ্রুত বাড়তে দেয়নি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে দেশের অন্যান্য শহরে ও গ্রামে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেয়ার ফলে এখন শহর ও গ্রামের জনগণের জীবনযাত্রার মানের পার্থক্য ওখানে তেমন বাড়তে পারেনি। ১৯৮২ সাল থেকে তিন দশক ধরে মারাত্মক গৃহযুদ্ধের কবলে না পড়লে শ্রীলংকা সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া ও হংকংয়ের পর পঞ্চম ‘এশিয়ান টাইগার’ হয়ে উঠত বলে ধারণা করা হয়। ২০২৪ সাল থেকে শ্রীলংকা আবার উচ্চ প্রবৃদ্ধির দেশ হয়ে উঠবে বলে আমার ধারণা। অতএব এখন বাংলাদেশের লক্ষ্য হওয়া উচিত মাথাপিছু জিএনআইয়ের দিক থেকে আগামী কয়েক বছরে শ্রীলংকাকে ছুঁয়ে ফেলা। দুর্নীতি, পুঁজি লুণ্ঠন ও পুঁজি পাচারের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করতে পারলে বাংলাদেশের জন্য এ টার্গেট অর্জন দুঃসাধ্য হবে না।

**লেখক:** ড. মইনুল ইসলাম: সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, একুশে পদকপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ ও অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ।

**সূত্র:** বণিক বার্তা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কপিরাইট আইন দ্বারা সংরক্ষিত।
Live Written™ অ্যাপ, সাইট কিংবা লেকচার কোন অংশ নকল করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
© CrackTech

## ৫. ব্যাংকিং খাতে অস্থিরতা ও বাজেট

বাংলাদেশের ব্যাংক খাতের প্রতি মানুষের আস্থাহীনতা অনেকটা চরমে পৌঁছেছে। নানা অনিয়ম-দুর্নীতিতে নিমজ্জিত ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি মানুষের ইতিবাচক কোনো ধারণা নেই বললেই চলে। খেলাপিঋণ, তারল্য সংকট, অর্থপাচার এবং মালিক ও কর্মকর্তাদের অনিয়ম এখন জাতীয় অর্থনীতির জন্য বিষফোড়াসদৃশ। দেশের ব্যাংক খাতে তারল্য সংকট কতটা প্রকট তার নমুনা দেখা গেছে মৌলভীবাজার জেলায়। মাত্র ১০-২০ হাজার টাকা তোলার জন্য দিনের পর দিন ধরনা দিলেও গ্রাহককে তা সরবরাহ করতে পারেনি বেসরকারি একটি ব্যাংক। ব্যাংকসহ আর্থিক খাতের এমন দুরবস্থা একদিনে হয়নি। বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন বেশ চাপের মুখে আছে। তার ওপর আর্থিক খাতের এমনতর অস্থিরতা দিন দিন ঘনীভূত হচ্ছে। আর এসবের মাঝেই দেশে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণার সময় ঘনিয়ে এসেছে। অর্থনীতি বিশ্লেষকরা বলছেন, আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা ফেরাতে বিগত অর্থবছরের বাজেটগুলোতে নেওয়া অনেক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যায়ে গিয়ে 'কাগুজে বাঘে' পরিণত হতে দেখা গেছে। তাই আসন্ন বাজেটে এ বিষয়ে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকতে হবে।

তা-না হলে দিন দিন বিপজ্জনক পথের দিকে ধাবিত হওয়া বাংলাদেশের ঋণ পরিস্থিতি জাতীয় অর্থনীতিতে বড় ধরনের বিপর্যয় বয়ে আনবে। আসন্ন বাজেট ঘোষণা একটি দিনের কয়েকটি ঘণ্টার মধ্যেই সম্পন্ন হলেও এর প্রণয়ন প্রক্রিয়া বেশ কয়েক মাস ধরেই চলে। ফলে, বলা যায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের অনেকটা প্রণীত হয়ে গেছে। এ অবস্থায় সরকারকে কোনো পরামর্শ দিয়ে কোনো কাজ হবে কি-না, তা নিয়ে কারও কারও মনে জাগতে পারে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, অর্থমন্ত্রী মহোদয় যে বাজেট ঘোষণা করতে যাচ্ছেন, তা আসলে খসড়া বাজেট। জাতীয় সংসদে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পরই কেবল তা অনুমোদন পায়। এ অবস্থায় কিছু পরামর্শ আমাদের নীতিনির্ধারকদের উদ্দেশে দেওয়াই যায়।

নিকট অতীতে সংঘটিত ব্যাংকিং অঘটন ও কেলেঙ্কারিসমূহ আগ্রহী ব্যাংক কর্মকর্তাদের ঋণ প্রদানে অনুৎসাহী করছে; ব্যবসার অনুকূল পরিবেশের অভাবে ভালো ঋণগ্রহীতাদের মধ্যেও উৎসাহ অনেক কমে গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকগুলোর খেলাপিঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৪৫ হাজার ৬৩৩ কোটি টাকা। দেশের চলমান অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে ব্যাংকিং খাতের ঋণ আদায়ে ধীরগতি অব্যাহত আছে। ফলে, এই খাতে খেলাপি ঋণের অনুপাত এক বছর আগের ৮ দশমিক ১৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৩ সালে ৯ শতাংশ হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৪৫ হাজার ৬৩৩ কোটি টাকা, যা তাদের মোট ঋণের ৯ শতাংশ। ২০২২ সাল শেষে খেলাপিঋণের পরিমাণ ছিল ১ লাখ ২০ হাজার ৬৫৬ কোটি টাকা, যা মোট ঋণের ৮ দশমিক ১৬ শতাংশ। ২০২২ সালের তুলনায় গত বছর খেলাপিঋণ বেড়েছে ২৪ হাজার ৯৭৭ কোটি টাকা বা ২০ দশমিক ৭০ শতাংশ। ২০২৩-এর সেপ্টেম্বর শেষে ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর খেলাপিঋণ ছাড়িয়েছে ২১ হাজার ৬৫৮ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), গত পাঁচ বছরে ধরা পড়েছে ১ হাজার ১১২টি সন্দেহজনক লেনদেন। এসব সন্দেহজনক লেনদেনের অধিকাংশই ব্যাংকসমূহের যোগসাজশে সংঘটিত হয়েছে, যার মাধ্যমে দেশের শত শত কোটি টাকা পাচার হয়েছে বিদেশে। এসব বাংলাদেশী টাকা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বাইরে চলে যাওয়ায় তারল্য পরিস্থিতি দিন দিন নাজুক হচ্ছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে ওয়াকিফহাল মহলগুলো অনেক দিন ধরেই বলছে, ব্যাংকিং খাতের সংস্কারে জাতীয় বাজেটে ঘোষিত অনেক উদ্যোগ বাজেটের দলিল গ্রন্থেই এখন কেবল শোভা পায়। বাস্তবে বেশিরভাগ উদ্যোগ ও পরিকল্পনা অকার্যকর রয়ে গেছে। আর এ কারণে দিন যত যাচ্ছে, ততই গভীরতর হচ্ছে আর্থিক খাতের চ্যালেঞ্জ। এ অবস্থায় ব্যাংক খাতে যেন তারল্য সংকট না বাড়ে আসছে বাজেটে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সরকারকে অবশ্যই ব্যাংক খাত থেকে ঋণ নেওয়ার প্রবণতা কমাতে হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কপিরাইট আইন দ্বারা সংরক্ষিত।
Live Written™ অ্যাপ, সাইট কিংবা লেকচার কোন অংশ নকল করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
© CrackTech

এর বদলে পুঁজিবাজার ও কর ব্যবস্থার ওপর নজর দিতে হবে। কর ব্যবস্থার দিকে নজর দেওয়া মানে যেন আবার ভ্যাটের মতো অন্যায্য পরোক্ষ করের প্রতি না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। সরকার যদি অন্তত ৩০ শতাংশ ধনী ও বিত্তবান মানুষকে তাদের প্রদেয় কর দিতে বাধ্য করতে পারে, তাহলে সরকারকে কোনো ঋণই করতে হয় না। আমাদের ধনীদের কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বিশ্ববিদিত। এ ছাড়া আর্থিক খাতের সংস্কারে আগের অর্থবছরের বাজেটে নেওয়া নানা উদ্যোগ কাগজে-কলমে আটকে থাকার কারণ ব্যাখ্যা করাও আসন্ন বাজেটে অর্থমন্ত্রীর করণীয়। বাজেটে আর্থিক খাতকে বাঁচাতে খেলাপিঋণ আদায় এবং অর্থপাচার রোধে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ থাকতে হবে এবং তা বাস্তবায়নের রূপরেখাও মানুষের সামনে হাজির করতে হবে। কারণ, আর্থিক খাতের প্রতি সীমাহীন আস্থাহীনতা দেখা দিয়েছে। নীতি নির্ধারকদের মনে রাখা প্রয়োজন, অবকাঠামো উন্নয়ন করা জরুরি। তবে বাজেটে সরকার ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ নেওয়ায় বঞ্চিত হয় বেসরকারি খাত। সরকারের গ্রহণ করা ঋণ জাতীয় উন্নয়নে ব্যবহৃত হলেও সর্বব্যাপ্ত ঘুষ-দুর্নীতি সরকারের ভালো কাজে নেওয়া ঋণের অর্থ খেয়ে ফেলছে। এতে করে পরজীবী একশ্রেণির গোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে, যারা কোনো কিছু না করেও বিপুল অর্থের মালিক হচ্ছে এবং বাংলাদেশের আর্থিক খাত থেকে অর্জিত অর্থ দিয়ে বিদেশ-বিভুঁইয়ে বাড়ি-গাড়ি করছে। মন্দ ও খেলাপিঋণ, অর্থপাচার, অনিয়ম, দুর্নীতির লাগাম টানা ও সুশাসন নিশ্চিত করা না গেলে আরও ভয়াবহ সংকটে পড়বে দেশের অর্থনীতি। তাই মন্দ ও খেলাপিঋণের পরিমাণ কমিয়ে ব্যাংকিং খাতে তারল্য বাড়াতে হবে। সম্প্রতি জোড়াতালি দিয়ে ১০টি ব্যাংক একীভূতকরণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেওয়া উদ্যোগ হোঁচট খেয়েছে। এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা আসন্ন বাজেটে থাকবে হবে।

বাংলাদেশের পুরোপুরি অসুস্থ হয়ে পড়া ব্যাংকগুলোর প্রকৃত আর্থিক চিত্র কেমন, আমাদের আর্থিক খাতের কর্তাব্যক্তিরা ছাড়া কেউই জানেন না। অনেকের ধারণা, আসলে এসব জানতে দেওয়া হচ্ছে না। বাংলাদেশে ব্যাংকে গণমাধ্যমকর্মীদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা এ আশঙ্কাকে আরও জোরালো করছে। এমনটা হওয়া উচিত না। এখন দুর্বল ব্যাংকগুলোর ঋণ পরিস্থিতি বেশ নাজুক। অনেক ব্যাংকে বেনামি ঋণ রয়েছে, যা প্রকৃত খেলাপি ঋণের চিত্রে উঠে আসছে না। আর এ কারণেই সম্ভবত ভালো ব্যাংকগুলো দুর্বল ব্যাংকগুলোর দায়দায়িত্ব নিতে চাচ্ছে না। ফলে, ব্যাংক একীভূত করার প্রক্রিয়াটি নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এতে করে আস্থাহীনতা আরও বাড়ছে। দুর্বল ব্যাংকের প্রভাবে ভালো ব্যাংকগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হলে ব্যাংকিং খাতের ওপর থাকা অবশিষ্ট আস্থাটুকুও বিনষ্ট হবে, তা আমাদের নীতিনির্ধারকদের এখনই অনুধাবন করতে হবে। এসব বিষয়ে আসন্ন বাজেটে স্পষ্ট বক্তব্য থাকতে হবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি সুসংহত হলে স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা ব্যাংকের সংখ্যা এত বেশি থাকত না। থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার অর্থনীতির আকার বড়। ব্যাংকিং খাতের সুপরিচালনা এ আকার বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রেখেছে, যা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত করেছে। অর্থনীতির আকার বিবেচনায় সেসব দেশে স্থানীয় ব্যাংকের সংখ্যা বাড়েনি, সেসব দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হওয়ায় সেখানে বিদেশী ব্যাংকগুলোর সংখ্যা বাড়ছে। থাইল্যান্ডের জিডিপির আকার ছাড়িয়েছে ৫০০ বিলিয়ন ডলার। দেশটিতে সরকারি খাতে মাত্র ছয়টি এবং বেসরকারি খাতে মাত্র ১২টি ব্যাংক। অর্থাৎ সব মিলিয়ে দেশটিতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত নিজস্ব ব্যাংকের সংখ্যা ১৮। এশিয়ার অন্যতম ধনী দেশ সিঙ্গাপুরে স্থানীয় ব্যাংকের সংখ্যা মাত্র পাঁচটি। উদীয়মান অর্থনীতির দেশ মালয়েশিয়ায় স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা ব্যাংকের সংখ্যা মাত্র আটটি।

অর্থনীতি শক্তিশালী হওয়ায় প্রতিনিয়ত দেশগুলোয় বিদেশী ব্যাংকগুলো শাখা খুলছে। থাইল্যান্ডে ৪৫টি, সিঙ্গাপুরে ২২টি ও মালয়েশিয়ায় ২৬টি বিদেশী ব্যাংক। ভারতেও আমাদের চেয়ে ব্যাংকের সংখ্যা কম। দেশটিতে ১২টি সরকারি ও ২২টি বেসরকারি ব্যাংক রয়েছে। তবে ভারতে অঞ্চলভিত্তিক ৪৩টি ব্যাংকের পাশাপাশি ৪৬টি বিদেশী ব্যাংকও কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফিলিপিন্সের সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে মোট ১৭টি ব্যাংক। তবে ফিলিপিন্সে কার্যক্রম পরিচালনা করছে ২৯টি বিদেশী ব্যাংক। অন্যদিকে এসব দেশের তুলনায় ব্যাংক খাতে বাংলাদেশের চিত্র পুরো উল্টো। বর্তমানে দেশে তফসিলভুক্ত ব্যাংকের সংখ্যা ৬১। এর মধ্যে বিদেশী ব্যাংক ৯টি। ৩টি বিশেষায়িত ব্যাংকসহ দেশে মোট ৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকও আছে। বাকি ৪৩টি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেসরকারি উদ্যোগে। বাংলাদেশের অর্থনীতির আকারের তুলনায় বাংলাদেশে ব্যাংকের সংখ্যা অনেক বেশি। প্রভাবশালী বিবেচনায় প্রতিনিয়তই নতুন নতুন

ব্যাংকের অনুমোদন দিচ্ছে সরকার। ফলে, ব্যাংক খাতে বেড়েছে অস্থিতিশীলতা। সেই সঙ্গে বেড়েছে অনাদায়ী ঋণ ও খেলাপিঋণের পরিমাণ। এছাড়া দেশের প্রায় সব ব্যাংকেরই মূলধন কাঠামো দুর্বল। নতুন করে কোনো বিদেশী ব্যাংকও দেশে আসছে না। আশির দশকে যেসব বিদেশী ব্যাংক দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করত, তারাও নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে গেছে। তবে ব্যাংক খাতে এ অসুস্থ প্রতিযোগিতা ও রাজনৈতিক বিবেচনায় ব্যাংক অনুমোদন বন্ধ না হলে দেশের ব্যাংকিং খাত ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে থাকবে।

তারল্য সংকট, টাকার অবমূল্যায়ন, বৈদেশিক হিসেবে ঘাটতিসহ সামষ্টিক অর্থনীতির চাপে থাকা নিরসন করতে হলে আসন্ন বাজেটে সময়নির্দিষ্ট যথাবিহিত পরিকল্পনা ঘোষণা করা হলে আঁশ করা যায়, দ্রুত বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের ওপর মানুষের আস্থা ফিরে আসবে।

**লেখক:** ড. মো. আইনুল ইসলাম, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়: সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।
**সূত্র:** দৈনিক জনকণ্ঠ।

## ৬. মেরিটাইম সিল্ক রোডে বাংলাদেশের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ

কেবল সমুদ্রের জন্য বাংলাদেশকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না চীন। চীনের জন্য স্থলপথের নেটওয়ার্ক বিস্তারেও বাংলাদেশের ভূমিকা রয়েছে। দেশটির স্থলবেষ্টিত দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশগুলো, বিশেষ করে ইউনানকে ভারত মহাসাগরের সঙ্গে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অবদান রাখতে পারে। এসব কারণেই সিল্ক স্ট্রিট ইকোনমিক বেল্টের পাশাপাশি একবিংশ শতাব্দীর মেরিটাইম সিল্ক রোডেও বাংলাদেশের অংশগ্রহণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে চীন সরকার। ২০১৬ সালে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বাংলাদেশে ঐতিহাসিক সফরের পর থেকে এ পর্যন্ত শত শত কোটি ডলার আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে বেইজিং। ফলে চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড অ্যাক্টিভিটিতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বেড়েছে।

বাংলাদেশে ১ হাজার কোটি ডলার সমমূল্যের অবকাঠামো প্রকল্প গ্রহণ করেছে চীন। এসব প্রকল্পের মধ্যে চাইনিজ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন, পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, অষ্টম চীন-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ ব্রিজ এবং আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী কেন্দ্র অন্যতম। বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের (বিআরআই) আরো দুটি প্রকল্প কর্ণফুলী নদী টানেল প্রকল্প এবং পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের কাজ এরই মধ্যে শেষ হয়েছে। পাশাপাশি আর্থিক ও বাণিজ্যিক দিক থেকেও কিছু প্রকল্প বিবেচনাধীন আছে। চীন-বাংলাদেশ ফ্রি এক্সচেঞ্জ জোন নির্মাণ নিয়েও আলোচনা চলছে। চীনের মতে, এ প্রকল্প নির্মাণ হলে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের দেড় হাজার কোটি ডলারের বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতা হ্রাসে সহায়তা করবে। উল্লেখ্য চীন এরই মধ্যে বাংলাদেশের ৯৮ শতাংশ পণ্যকে তার বাজারে শুল্ক মুক্ত প্রবেশের সুযোগ দিয়েছে। বাংলাদেশের নিজস্ব বন্দরের অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে নিজস্ব বাণিজ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশগুলোর জন্যও এ অবকাঠামোগুলো বাণিজ্য বাড়াতে সহায়তা করবে, যাতে মেরিটাইম সিল্ক রুট একটি বড় প্রভাবক হিসেবে কাজ করবে।

মেরিটাইম সিল্ক রুটের জন্য চট্টগ্রামকে যাতে সামুদ্রিক লোড কেন্দ্র হিসেবে বাছাই করা হয় সেজন্য চীনের সঙ্গে যোগাযোগ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ সরকার। এছাড়া চট্টগ্রাম বন্দরকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করে তোলার পাশাপাশি বন্দরের পরিচালন কার্যক্ষমতা আরো বাড়ানোর লক্ষ্যে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড বিশেষজ্ঞদের সঙ্গেও কথা বলেছে বাংলাদেশ। এসব লক্ষ্য পূরণ করতে হলে বাংলাদেশকে মানসম্পন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনা, সুশাসনের বিষয়ে আরো অগ্রগতি অর্জন করতে হবে, এর ফলে আঞ্চলিকভাবে আমাদের বন্দরগুলো ব্যবহার করে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তুলনামূলক সুবিধাপ্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।

মেরিটাইম সিল্ক রুটের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হচ্ছে শ্রীলংকার কলম্বো, এ বন্দরের সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে তার অবস্থান মূল সমুদ্রপথের নিকটবর্তী এবং একটি গভীর সমুদ্রবন্দর হিসেবেও উপযোগী, যদিও বন্দরটি একটি দ্বীপের অংশ হওয়ায় এবং মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে না হওয়ায় মেরিটাইম সিল্ক রুটের প্রধানতম আঞ্চলিক বন্দর হওয়ার উপযোগী নয়। বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমারের বন্দরগুলো মূল ভূখণ্ডের অংশ হওয়ায় এর মধ্যে কোনো একটি বন্দর হতে পারে মেরিটাইম সিল্ক রুটের আঞ্চলিক বন্দর (প্রাইমারি পোর্ট বা হাব পোর্ট)।

বন্দরের বার্ষিক মোট মালামাল খালাসের সক্ষমতার বিচারে কলকাতা অথবা চট্টগ্রামকে প্রাধান্য দেয়া হতে পারে। এক্ষেত্রে একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে—কলকাতা পোতাশ্রয়টি খুবই সংকীর্ণ। হোল্ডার এক্সচেঞ্জ, নিরাপত্তা এমন সবদিক বিবেচনা করলে চট্টগ্রাম পোতাশ্রয়টি শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের মতো এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় বন্দরগুলোর জন্য সবচেয়ে সেরা সংযোগকারী হবে।

নানা জল্পনা-কল্পনার মধ্যেই ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোডের অধীন বন্দর এবং লজিস্টিক কেন্দ্রগুলোয় বিনিয়োগ শুরু করেছে চীন। এদিক থেকে হারবারের ড্রেজিং, নতুন নতুন বে-টার্মিনাল, উন্নতমানের আধুনিক ক্রেনসহ অভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যবস্থার জন্য ব্যাপক বিনিয়োগ আকর্ষণ করার সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশের। অভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যবস্থার মধ্যে বন্দর থেকে গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোয় সরাসরি পণ্য পরিবহনে ডাবল ডেকার চলাচলের জন্য রোড-রেল-হাইওয়ে নির্মাণ উল্লেখযোগ্য হতে পারে।

সড়ক রেলপথ সংযোগ থেকে মেরিটাইম এভিয়েশন লিংক, বাণিজ্য সুবিধা পরিবহন, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থলগ্নি, ক্রিপ্টো কারেন্সি এবং বিকল্প মুদ্রার প্লাটফর্ম, ফাইভজির জন্য স্মার্ট ডিভাইস, মেশিন লার্নিংয়ের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো প্রযুক্তি ও সময়ের সঙ্গে বিআরআইয়ের ধারণাগুলোও দ্রুত বিকাশ হচ্ছে। বিষয়টি বাংলাদেশের জন্য প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি সুযোগ এনে দিতে পারে।

অন্যদিকে সংখ্যায় কম হলেও বিভিন্ন দেশে ব্যর্থ অথবা পরিত্যক্ত বা অকেজো বিআরআই প্রকল্পের ঘটনা রয়েছে। এ ধরনের ঘটনা সংখ্যার দিক থেকে কম হলেও এটি বাংলাদেশের জন্য অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান থাকারই প্রমাণ বহন করে। বাংলাদেশের যেসব বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে তার মধ্যে চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মতো শক্তিধর দেশগুলোর সঙ্গে দরকষাকষির সক্ষমতা বাড়াতে এনজিপি দেশগুলোর (স্বল্পোন্নত) মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা অন্যতম। শুধু তা-ই নয় বিনিয়োগ পাওয়ার জন্য নিম্ন সুদহার এবং অন্যান্য শর্ত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এবং বিশ্বব্যাংকের মতো আন্তর্জাতিক ঋণদাতা সংস্থাগুলোর সঙ্গে তুলনীয় হওয়া উচিত। প্রকল্পের উৎপাদনশীলতা এমন হতে হবে যাতে করে বাংলাদেশ, শ্রীলংকা ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশের মতো ঋণফাঁদে জড়িয়ে না পড়ে। জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষার জন্য চুক্তি বা স্মারকপত্র সইয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মাত্রার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে। বৈদেশিক নীতিমালা গঠনে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন, ব্যবসায়িক সংগঠন, পরিবেশবাদী দলগুলোকে সম্পৃক্ত করে একে আরো পরিপূরক করে তোলা যায়।

এছাড়া পর্যাপ্ত নীতিমালা, সুশাসন এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবের মতো অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জও রয়েছে। চীনের এসআরইবি, এমএসআর এমনকি জাপান, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্রের ব্লু ডট নেটওয়ার্ক, আইপিএসের মতো উদ্যোগগুলোর সুযোগ গ্রহণে এই চ্যালেঞ্জগুলো বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারে।

**ব্যবসা ও যোগাযোগের আঞ্চলিক কেন্দ্র হয়ে ওঠার উপায়**

এদিকে ১৯৪৮ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত বাইপোলার এবং ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ইউনিপোলার যুগের, সেন্ট্রাল ট্রিটি অর্গানাইজেশন (সেন্টো), সাউথ ইস্ট এশিয়া ট্রিটি অর্গানাইজেশন (সিয়াটো) এবং নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি (ন্যাটো) অর্গানাইজেশনের মতো শীতল যুদ্ধের সময়ের জোটগুলো যে চীনের উত্থান ও মাল্টিপোলার যুগের আবির্ভাবের প্রভাব সামাল দিতে পর্যাপ্ত নয় তা কিন্তু প্রমাণিত। উল্লেখ্য বিশ্বের অর্থনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোর অধিকাংশই দুটি দেশের মাধ্যমে প্রভাবিত হলে সে সময়কে

বাইপোলার যুগ বলা হয়। বাইপোলার বিশ্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে শীতলযুদ্ধ। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এদের আধিপত্য ছিল।

এদিকে চীনের প্রভাবে দৃশ্যপট পরিবর্তনের ফলে প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগর অঞ্চলকে একটি একক নিরাপত্তা ইউনিট হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য পর্যালোচনার সূচনা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এখানে যুক্তরাষ্ট্রের আগের নীতিমালায় ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে দুটি পৃথক কৌশলগত অঞ্চল হিসেবে দেখানো হয়েছিল, পরে তা পরিবর্তনের কথা বলা হয়। এ প্রেক্ষাপটে দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের শক্তিশালী উত্থান এবং শ্রীলংকায় নৌঘাঁটি স্থাপন, একদিকে বঙ্গোপসাগরের গুরুত্ব এবং অন্যদিকে এর দুর্বলতা কেউ তুলে ধরেছে।

বাংলাদেশের জন্য মেরিটাইম সিল্ক রুটকে বলা যায় সীমাহীন সুযোগের পাইপলাইন। এর জন্য বাংলাদেশকে একটি মানসম্মত ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগ করতে হবে যা প্রত্যাশিতভাবেই দীর্ঘমেয়াদি সুবিধা দেবে। এছাড়া চীন বাংলাদেশের তৈরি পোশাক বা আরএমজি ব্যবসায় সহায়তা করছে। কারণ দেশটি কম কর ও যুক্তিসংগত দামে মোড়কজাত পণ্যগুলো সরবরাহের জন্য, আমদানির বাজারে পাঠাতে নিজের অব্যবহৃত ব্যবসায়িক সক্ষমতাকে কাজে লাগাতে চাইছে। মেরিটাইম সিল্ক রুটের প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশ ওবিওআর কার্যক্রম থেকে লাভবান হবে; বিশেষ করে বাংলাদেশের বন্দর অবকাঠামো তৈরি এবং অভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যবস্থাপনা উপকৃত হবে। এ পুরো প্রক্রিয়াকে সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বাংলাদেশকে শুরু করতে হবে একটি মেরিটাইম পলিসি প্রণয়নের মাধ্যমে, এরপর প্রণীত পলিসির আলোকে মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত প্রকল্পগুলোকে জাতীয় অগ্রাধিকার ও গুরুত্ব বিবেচনায় সফলভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।

**লেখক:** ১. ড. রেজাউল করিম চৌধুরী, ক্যাপ্টেন, মেরিটাইম পরামর্শদাতা, আইনজীবী; বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অব মালয়েশিয়া, টেরেংগানুতে গবেষণারত।
২. কাজী মো. আবু সাইদ, মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, এমএস, মেরিটাইম পলিসি, ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া টেরেংগানু।
**সুত্র:** বণিক বার্তা।

## ৭. Bangladesh is planning green, but acting red

Power generation accounts for 27% of global CO2 emissions, and transportation accounts for nearly 16%. Our government has set an ambitious target of getting 40% of its electricity from renewables by 2041 to combat climate change, as stated in the Mujib Climate Prosperity Plan 2041. However, despite past targets, only about 4% of Bangladesh's electricity currently comes from renewables.

It is essential for the government to understand that solely depending upon renewables to meet the 2041 target is difficult. Although renewable source solar has potential, the current level of adoption of solar technology in Bangladesh is still small, compared to consumer demand for power.

Countries like Bhutan and Nepal generate around two-thirds of their power from renewables, and government officials often cite them as examples. However, Bangladesh has much higher population density, industrial growth, and power demand, making it harder to achieve similar results.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কপিরাইট আইন দ্বারা সংরক্ষিত।
Live Written™ অ্যাপ, সাইট কিংবা লেকচার কোন অংশ নকল করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
© CrackTech

## The taboo around nuclear

Given Bangladesh's small size and large population, it's more logical to look at France as an example. Despite having huge power demand, France relies heavily on nuclear power. While often considered "dangerous," nuclear power is actually the safest form of mass power generation today.

As of 2021, coal-fired power plants caused 24.6 deaths per terawatt-hour (TWh) of power generated globally, while nuclear power caused only 0.07 deaths per TWh, the lowest. Although nuclear power isn't renewable, it's arguably the cleanest form of energy. But does the government recognise this?

Despite progressing with the Rooppur Project for nuclear energy, the government hasn't officially recognised it as a clean energy source in legal documents. From BERC Act (2003) to Renewables Energy Policy (2008) and SREDA Act (2012), Bangladesh has only been able to develop a definition of "Renewables" but not "Clean Energy".

To meet the government's target of 40% solely through renewables, Bangladesh will require a consistent FDI of 1.71 billion USD per year. Considering the consistent drop of foreign reserves, the possibility of this happening is still uncertain.

I believe it would be logical for the government to declare nuclear power as a clean form of energy to strengthen the clean energy transition that the government is undertaking. This is important because currently, nuclear energy is often seen as environmentally risky, similar to coal.

## Not enough incentive to go solar

In Bangladesh, about 85% of the renewables segment relies on solar power. Because of this, the government has prioritised the development of solar energy. They even published the Net Metering Guidelines in 2018 to promote Net Metered Rooftop Solar.

Unfortunately, the push for net metered rooftop solar hasn't been as significant as expected. The Net Metering Guidelines (2018) don't offer enough benefits or incentives to end users, nor do they reduce their risks. Despite claims from companies developing net metered systems that solar panels should last around 20 years, these organisations don't face any legal liability for faulty or malfunctioning products.

A study found that by 2021, DESCO and DPDC had installed 34,000 and 47,000 rooftop solar systems in Bangladesh, respectively. Unfortunately, 87.5% of the panels set up by DESCO and 59.57% of those set up by DPDC were found either malfunctioning or out of service.

When suppliers were asked why the equipment cost was so high, the simple response was, "Our purchase cost is high." And why wouldn't it be? The Customs Tariff (2023-24) imposes steep taxes on two key

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কপিরাইট আইন দ্বারা সংরক্ষিত।
Live Written™ অ্যাপ, সাইট কিংবা লেকচার কোন অংশ নকল করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
© CrackTech

components for rooftop solar systems: Static Converters (37%) and Solar PV cells (26.2%). These taxes significantly increase the prices of these essential equipment.

So, why would someone choose renewables when the upfront investment is high, and there's no guarantee the equipment will operate as long as promoted?

**The contradictions in policy**

While in 2015 the government declared "Rampal" and "Maheshkhali" as two ecologically critical areas, the government is also setting up two 1300+ MW coal-fired power plants in both the locations. Such practice is perceived by people as akin to planting a single tree while destroying an entire forest.

Such action not only contradicts the government's plans but also the established legislative framework. The Environment Conservation Rules (2023) considers both Nuclear Power and Coal-Fired Power Plant (Above 50MW) as a "Red" category - the most dangerous industries.

Interestingly, the same document declares Solar Power Plants Above 50 MW as at par with Coal Fired Power Plants (within 50MW); and considers both under the "Orange" category - a category that signifies industries having moderately high environmental impacts.

As such, construction of 1300+ MW power plants in these locations directly contradicts the gazette documents, which prohibit any activities that may harm the environment and biodiversity. These include the Environmental Conservation Act (1995): Section 5(4), the Ecologically Critical Area Management Rules (2016): Section 18, the Bangladesh Biodiversity Act (2017): Section 33 and Legal Notice No. 22.00.0000.073.13.004.2014-136.

So why such action? Do we really need these plants so badly? If so, then why coal? We already have more capacity than needed, with many plants not operating at full capacity.

**Making EVs expensive**

In 2023 alone, nearly 500,000 vehicles in Bangladesh were found "unfit" in an official document, but the actual number is likely much higher. According to Section 6 of the Environment Conservation Act (1995), these unfit vehicles should not be allowed to operate on the road. However, the reality is quite the opposite at present.

The transportation sector is also making an unplanned green transition linked to the power sector. To facilitate this transition, the government issued Electronic Vehicle Charging Guidelines (2022), emphasising the need for electric vehicles (EVs) in the country.

While the idea of EVs in Bangladesh is still developing, Sub-section 4.1.1 of the policy mandates EV owners to pay charging fees based on household retail tariff rates. This places a heavy burden on EV users because

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কপিরাইট আইন দ্বারা সংরক্ষিত।
Live Written™ অ্যাপ, সাইট কিংবা লেকচার কোন অংশ নকল করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
© CrackTech

the BERC (Amendment) Act of 2023 permits the government to alter retail tariff rates whenever necessary. This lack of incentive makes it challenging for users to opt for EVs over traditional polluting cars.

The Finance Act (2023) also imposes an equal amount of Carbon Tax on both EVs and traditional polluting cars. For instance, both a 3000-4000cc car and a 175kW capacity EV face a 500% carbon tax. What's more, this tax is only applied to additional vehicles owned by an individual, and is specific to the automotive industry, not other polluters.

**Lack of integrated planning and foresight**

From my perspective, the current policy environment lacks integrated planning and foresight. The contradictions between plans, regulations, and policies, along with actions like approving large coal-fired power projects in ecologically sensitive areas, are concerning. It appears that short-term economic interests are often given precedence over long-term sustainability goals.

The government should embrace new technologies that help more people adopt renewable energy. For example, MIT is looking into filament-based paper-solar cells, and the Turkish government is testing ENLIL, a roadside renewable power generator. However, instead of investing in these solutions, we're still spending a lot on idle power plants.

I strongly believe that Bangladesh has every resource to ensure a significant green power transition, but what hinders our growth is the legal bottlenecks and shortsightedness.

A factory will set up a solar power plant of 200 KW to promote their ESG practices and get government incentives. But such action adds a near to zero value since the factory may have a demand of 20,000 KW of power. I think the government should only offer incentives to users, especially commercial and industrial workers, who make up 99% of renewable energy users, and who can meet a certain threshold. Otherwise, these superficial efforts will only increase government spending without leading to meaningful energy transition.

So, considering the current scenario, the question remains, are we really going "green"? Probably not. But, can we? I believe we can, if we stop acting red.

**Writer:** Ahnaf Chowdhury Niloy, Senior Consultant of Management Consulting at KPMG Bangladesh.
**Source:** The Business Standard.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কপিরাইট আইন দ্বারা সংরক্ষিত।
Live Written™ অ্যাপ, সাইট কিংবা লেকচার কোন অংশ নকল করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
© CrackTech

## ৮. Crawling peg: Promising a stable dollar

In response to either market pressure or advice from the International Monetary Fund, the central bank introduced the crawling peg exchange rate mechanism on 8 May.

The crawling peg system is new for Bangladesh. Generally, in this process, a middle rate is set to determine the exchange rate, along with upper and lower limits forming a band within which the rate can fluctuate. The market is regulated by adjusting this middle rate and band as needed. In the two weeks since its enforcement, the crawling peg seems to have yielded positive results for the country's dollar market. Banks are exercising more freedom in trading and there are indications of an easing of dollar liquidity.

Now is a good time to analyse how the system has achieved this and its potential for a balanced forex market in the upcoming months. Upon introducing the mechanism, the central bank set the Crawling Peg Mid Rate (CPMR) at Tk117. This caused a Tk7 spike in the official dollar rate, marking the highest single-day increase in the country's history. Banks were permitted to trade dollars around the CPMR without an official band, but were verbally advised to keep transactions within Tk116-118.

**No need to conceal rate info**

In terms of remittance dollars, the signals from the central banks play a crucial role in global currency markets. Consequently, the remittance dollar rate increased by Tk1-1.5 the day after the Bangladesh Bank announced the crawling peg while remittance inflows also rose. Previously, with a fixed exchange rate, banks collected remittances at higher rates and sold those dollars to importers at even higher rates. However, banks tended to conceal these high rates in various ways. Since the introduction of the crawling peg, banks' concealing information has decreased significantly and are now providing accurate information on dollar transactions to the central bank.

**Effect on remittance inflow**

Although the dollar rate for remittances has increased from Tk115-116 to Tk118-119 under the new system, there was no alternative considering the circumstances. The increase in remittance rates, however, has also benefited the banking sector. Central bank data shows $1.38 billion in remittances arrived in the first 17 days of May. Bankers expect that if this pace continues, Bangladesh could receive close to $2.5 billion in remittances by the end of the month.

In the first 10 months of the current fiscal year, remittances averaged less than $2 billion. Therefore, with the introduction of the crawling peg, remittances are likely to increase by an additional $500 million in May.

**Interbank dollar transactions**

After two years, the crawling peg system has enabled the resumption of interbank dollar transactions. State-owned and private banks had halted such trading since September 2022 due to fixed dollar rates by the Association of Bankers, Bangladesh, and Bangladesh Foreign Exchange Dealers Association. Banks were forced to buy dollars at inflated rates but could not disclose it. With interbank trading, banks had to accept the central bank's announced rate, leading to losses during dollar crises.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কপিরাইট আইন দ্বারা সংরক্ষিত।
Live Written™ অ্যাপ, সাইট কিংবা লেকচার কোন অংশ নকল করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
© CrackTech

The crawling peg has simplified this process. Previously, interbank sales were capped at Tk110, but now banks can sell up to Tk118, narrowing the gap with the market rate and facilitating interbank transactions.

Stakeholders believe if the system operates smoothly, interbank transactions will gradually resume. Many banks hold surplus dollars and selling them at market prices would increase dollar supply.

They also say banks with high dollar demand can then purchase from the interbank reducing competition for remittance dollars. With less competition, remittance dollar prices are less likely to spike suddenly in the market.

**Benefits to exporters**

Earlier, exporters used to get a maximum rate of Tk109.50 per dollar. After the introduction of the crawling peg system, they are getting a maximum rate of Tk118.

This means Bangladeshi exporters are getting about 8% more and gained some ground in competing with exporters from other nations. The banking sector has already started receiving the result of the increase in the dollar rate of export proceeds.

Managing directors of several banks told The Business Standard that exporters are now bringing home larger amounts of export proceeds. They are making efforts to collect payments which is improving dollar inflow and liquidity in banks.

Besides, due to exporters having access to more liquidity, it will increase their ability to determine the wages of the workers taking into account the inflation of the country.

**Moving forward**

Bankers said crawling peg is not a market-based dollar rate but a step towards it. They caution that it won't resolve all issues in the dollar market or maintain a low dollar rate. Proper implementation of the crawling peg is crucial, with adjustments informed by market reactions.

Firstly, they suggested the central bank officially set a clear band, possibly Tk2-Tk3 or 2%-3%. The current guidance of "around the CPMR" is not providing any clear direction to the market. Explaining the matter, they said the demand for dollars in the country now is much higher than supply as the rate is around Tk118 in the market. This creates upward pressure on the rate despite raising the dollar price. Therefore, the market should be allowed to function according to its own rules to avoid further depletion of forex reserves. The country's gross reserves currently stand at $18.61 billion, at least $5 billion less than usable reserves. Gross reserves at the beginning of the current fiscal year were $23.75 billion. That is, reserves have fallen by about 22% in a span of about 11 months. The main reason for this decline was the sale of dollars from reserves to state-owned banks to pay for government imports.

State-owned banks must collect dollars from the market according to their demand to prevent a fall in reserves. This will be possible only when the interbank dollar market is fully operational, bankers said.

.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কপিরাইট আইন দ্বারা সংরক্ষিত।
Live Written™ অ্যাপ, সাইট কিংবা লেকচার কোন অংশ নকল করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
© CrackTech

Secondly, the crawling peg is effective only if the mid-rate is flexible. The central bank has currently fixed the mid-rate at Tk117, but it should be updated regularly based on the daily Weighted Average Rate (WAR) of the dollar, which was Tk117.77 last Thursday. Bankers suggested using the WAR as the mid-rate for the next day's trading band to provide better market guidance and observation.

Thirdly, the dollar rate depends on the money supply. If banks and traders have ample money, the dollar rate will rise. To control the dollar rate and reduce inflation, the money supply must be decreased.

A banking expert noted that the central bank has successfully reduced the money supply in the past to control inflation. This tested method should be used again in the current situation. While the central bank is already trying to reduce the money supply, these efforts need to be intensified.

Besides, banks should reduce lending through tools like repo and the assured liquidity support facility (ALSF), he said. A reduced money supply will create liquidity stress, leaving banks with few options but to raise money by selling surplus dollars or borrowing through currency swaps. This will decrease dollar demand.

Although this approach may not favour investment growth, the central bank might need to make such tough decisions to resolve the crisis, he added. "Overall, the central bank should use the crawling peg and other tools to stabilise the dollar rate and market, while allowing the dollar market to run its course."

**Writer:** Tonmoy Modak.
**Source:** The Business Standard.

## ৯. Rising per capita income, rising inequality

OUR per capita income now stands, as the Bangladesh Bureau of Statistics says, at $2,784, or Tk 3,06144. Many of us think that the increase in per capita income means that the country has improved a lot or that the quality of life for people has changed a lot. The irony is that if the per capita income is high, it does not mean that the people of any country are very well off.

Let us say one person’s income is Tk 9,000. Another person’s income is Tk 1,000. This means the average per capita income of the two is Tk 5,000. It does not mean that both have equal income. So this is where the issue of income inequality comes in. The increase in national income is not development. Development is a much bigger and broader issue.

The per capita income of the country’s people was $2,749 in 2022–23, $2,793 in the 2021–22 financial year and $2,591 in the 2020–21 financial year. However, accurate national income calculation is not a very easy task. There can be many different types of errors such as the double-counting problem. A product may be counted twice in the calculation of national income.

For example, in the case of books and paper, if the values of books and paper are both counted in the national income, then the correct figure of national income will not be available because the price of the


© CrackTech

book includes the cost of the paper. In this case, once the costs of the paper as well as the book are calculated separately, the actual cost of the paper is calculated twice.

The per capita income of Bangladesh is $2,784. But how much economic change has happened in society, especially among low-income people, can be estimated only by looking at reality. The per capita income of the people of the country has increased over 21 times in 53 years of independence. It is estimated that by 2041, the per capita income of the people of Bangladesh will increase to more than $12,500. At that time, the poverty rate will decrease to zero, and the growth in gross domestic product will be 9.9 per cent. This goal has been fixed in the report entitled 'Bangladesh Second Perspective Plan 2021-2041' to implement Vision 2041.

A country's level of income inequality is measured by the Gini coefficient. A Gini coefficient value of zero indicates that there is extreme equality, and if its value is increasing to 0.5 or more, it means that the income inequality in the country has reached an extreme level. According to the report titled 'Household Income and Expenditure Survey 2022' of the Bangladesh Bureau of Statistics, the income of the rich in the country has increased, ie, income inequality has increased.

For example, the richest 10 per cent of the country now has 41 per cent of the total income. On the other hand, the income of the poorest 10 per cent of people is only 1.31 per cent of the total income of the country. According to the latest survey, two-thirds of the country's income goes to the richest 30 per cent of the country.

According to BBS data, in 2016 statistics, the poor population in the country was 24.3 per cent and the poorest population was 12.9 per cent. According to the report, the poor population is now 20.5 per cent in rural areas and 14.7 per cent in urban areas. According to the survey, the Gini coefficient of income in the country was 0.499 in 2022, compared to 0.482 in 2016 and 0.458 in 2010. In 1974, the Gini coefficient value in the country was 0.24. This suggests an increase in income inequality.

Meanwhile, Bangladesh is at the top of the list of the top 10 countries in the world in terms of creating the ultra-rich. According to a report published in 2020 by a research institute named Wealth X Institute in the United States, from 2010 to 2019, the super-rich in Bangladesh increased at an annual rate of 14.3 per cent. Super rich here means those whose total wealth is at least $30 million, or Tk 250 crore.

Various statistics have proved that Bangladesh is a country with high income inequality, and due to this income inequality, poor families are left behind from the opportunity to improve the quality of life, including quality education and health care. So, while the increase in average per capita income is promising, the simultaneous increase in income inequality is equally disappointing news.

A study published by the Bangladesh Institute of Development Research in May 2023 said that the income of both the rich and the poor has increased in Bangladesh in the past four years, but the lower middle class has seen the lowest rate of income growth. However, living costs have increased for all and income inequality has also increased. In the BIDS study, the same households surveyed in 2019 were again surveyed in 2022. Those who were described as wealthy in the institute's 2019 survey had an annual income of Tk

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কপিরাইট আইন দ্বারা সংরক্ষিত।
Live Written™ অ্যাপ, সাইট কিংবা লেকচার কোন অংশ নকল করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
© CrackTech

8,54,146 — Tk 71,000 a month. However, in 2022, their annual income increased to more than Tk 14 lakh. On the other hand, those who are 'lower middle class' whose annual income in 2019 was Tk 4,02,000, in 2022, their income is now Tk 4,38,000. According to the BIDS, the rich have become richer and the income gap between them and the poor and middle class has widened.

Bangladesh has made great progress in the last few years. It has surpassed many countries in terms of growth. But this growth did not benefit a larger segment of the population. The calculation of per capita income is always in disorder. Many have built mountains of money through corruption. Their average wealth is calculated to be high. Hawkers, rickshaw pullers, garment workers, and the unemployed are all shown as middle class. And the scene of swelling from the middle is covered.

Remarkably, politicians in developing countries are as enthusiastic and vociferous about GDP growth when success comes, but their concern over rising inequality is not observed. Growth in agricultural production is surely considered while calculating GDP. But it is not taken into account that the farmer is deprived of a fair price.

The news of rising per capita income is undoubtedly good news. But the government should also focus on the issue of income inequality. Our aim should be balanced social development and a balanced distribution of resources. It is everyone's hope that Bangladesh will become a social welfare state through economic self-reliance, along with the employment of unemployed people, and that the disparity between the rich and the poor will be reduced.

**Writer:** Md Zillur Rahaman, banker and columnist.
**Source:** New Age.

## ১০. From Hospitality to Hardship: A New Twist to Bangladesh's Rohingya Crisis

Bangladesh has showed unusual generosity in the face of one of the largest and most prolonged humanitarian crises in the world. It has been providing food and shelter for over a million Rohingya Muslims since 2017. However, the situation is worsening considerably for a number of reasons.

Therefore, the pressure on Bangladesh to host more Rohingyas appears simply disastrous. The fact remains, in recent times 45,000 Rohingya Muslims have fled to an area near the Naf River on the border with Bangladesh.

As they are seeking protection, UN Human Rights High Commissioner Volker Turk has urged Bangladesh and other countries to provide necessary protection to them as per international law.

Bangladesh has also been urged by UN High Human Rights Office spokesperson, Liz Throssell to not repatriate the Rohingya due to current conflicts inside Myanmar. A positive response to the UN call will be a suicidal leap into further crisis for Bangladesh.

.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কপিরাইট আইন দ্বারা সংরক্ষিত।
Live Written™ অ্যাপ, সাইট কিংবা লেকচার কোন অংশ নকল করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
© CrackTech

Given the existing socio-economic conditions, security threats and other problems besetting the Rohingyas in Bangladesh, an anti-importation posture taken by the government for hosting no Myanmar citizen anymore is quite a logical stance.

Myanmar's Rakhine State has been a hub of violence after the Rohingya are confronted by decades of systematic persecution. The crisis reached boiling point in August 2017, when the military launched a brutal crackdown on thousands of Rohingyas and they fled across the border with Bangladesh. Bangladesh responded quickly with generosity on humanitarian grounds.

Though Bangladesh is one of the most populous countries in the world, the government with Sheikh Hasina as the head opened its borders and admitted Myanmar nationals that created the world's largest refugee camp in Cox's Bazar, a town on the southeast coast of Bangladesh. Sheikh Hasina has received the appellation "The Mother of Humanity" for her humanitarian leadership.

Bangladesh is already under great strain by accommodating the unprecedented number of Myanmar citizens. The Rohingyas, the most persecuted people in the world according to the United Nations, are suffering from numerous ailments ranging from malnutrition to cholera and diphtheria. The healthcare services are beset with their immediate medical needs and the outbreaks of such diseases.

The education of Rohingya children continues to be a major issue barred from formal schooling that impedes their future prospects and integration into mainstream society.

What began as an outflowing of sympathy has already been driven to despair. Their long stay in Bangladeshi territory also poses security threats, for the Rohingyas are reportedly being radicalised and indulging in cross-border criminal activities complicating the overall scenario.

It is important to bear in mind this context while entertaining calls for admitting more Rohingyas to Bangladesh. The country has already shown incredible generosity. It is not only unfair but completely unviable to think that Bangladesh will continue to remain the sole bearer of the weight of the Rohingya rehabilitation.

The international community has utterly failed to provide necessary support that goes beyond immediate needs of the persecuted population and the host country as well.

Though there are many global organisations based on the principle of international burden-sharing, most of the victims of ethnic cleansing, in reality, have not received adequate financial assistance to help them return home or resettle in wealthier nations. The international community needs to do much more and on a long-term basis by providing greater and sustained support for Bangladesh.

This is the reason why, it is important to raise international financial aid for the maintenance and repatriation of the Rohingya. The current funding is not enough to meet the requirements for adequately caring for the refugees and the host country.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কপিরাইট আইন দ্বারা সংরক্ষিত।
Live Written™ অ্যাপ, সাইট কিংবা লেকচার কোন অংশ নকল করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
© CrackTech

The number of countries offering resettlement opportunities to Rohingya should be increased. Such relocation could lift some of the burden on Bangladesh and instil new hope into the Rohingya for living without discrimination. It requires a spirit of goodwill and solidarity between countries—a thing missing up until now.

Furthermore, there should be stronger global diplomatic pressure on Myanmar to ensure that safe and voluntary returns of the Rohingya people are feasible. This necessitates enabling their citizenship rights, ensuring safety from violence and access to livelihoods and essential services.

Though Rohingya repatriation efforts were launched, they have been halted because of the lack of assurances regarding their rights and safety. Bangladesh must maintain diplomatic efforts to make sure that Myanmar takes tangibly effective steps to create favourable conditions for smooth repatriation with the support of the international community.

The global community must now come forward and support Bangladesh in its repatriation endeavour out of moral obligation. This includes increasing aid for humanitarian purposes, supporting community development programmes and putting pressure on Myanmar to make rapid progress in the repatriation process.

The way Bangladesh has been welcoming citizens of Myanmar is commendable. However, they cannot be expected to keep shouldering this burden much longer.

The global society should identify the challenges of Bangladesh and provide tangible support. A generous support from them in terms of adequate funding and resettlement could bring about a fair and permanent solution to the long-drawn-out crisis.

The Rohingya can neither go back to their place, nor can they stay permanently where they are at this moment. It should not be forgotten that no one would choose exile unless they are compelled to. A real solution can be found only through an international coordination. Until such a solution is reached, not a single Rohingya should be admitted to Bangladesh and the UN should awaken to it and work accordingly.

**Writer:** Dr Rashid Askari, distinguished academic, bilingual author and former vice chancellor of Islamic University Bangladesh.
**Source:** Daily Sun.

========================o========================

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কপিরাইট আইন দ্বারা সংরক্ষিত।
Live Written™ অ্যাপ, সাইট কিংবা লেকচার কোন অংশ নকল করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
© CrackTech